পারের ডাক

ফররুখ আহম্মেদ

পারের ডাক

ফররুখ আহ্‌মেদ

হাতেখড়ি

পারের ডাক

ফররুখ আহম্মেদ

প্রকাশকাল	●	একুশে বইমেলা ২০১০
প্রকাশক	●	আবু তাহের সরকার হাতেখড়ি ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১৭৫১৮১
স্বত্ব	●	লেখক
শব্দবিন্যাস	●	সোলার কম্পিউটার
মুদ্রণ	●	গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড গেন্ডারিয়া ঢাকা-১২০৪ ফোন : ৭৪৪৩৬৭৪
প্রচ্ছদ	●	মশিউর রহমান
মূল্য	●	১০০ টাকা

Parer Dack by Forrukh Ahmmad. Published by Abu Taher Sarker. Printed by Gawchhia Press & Publications, Dhaka-1204. First Hate Khari Publication : Ekushey Book fair 2010. Cover Designed by Mosiur Rahman. Price : Tk. 100 only. US $ 3.

ISBN 984-70200-0060-0

উৎসর্গ

আমার প্রিয় কর্ণভাগ গ্রামবাসীকে

সূচীপত্র

১। না.....? ০৭
২। পারের ডাক ১২
৩। মনজিলা ২৯
৮। অপরাধ ৫০
৫। স্পৃহা ৫২
৬। বিরহ ৫৫
৭। ক-ফোঁটা জল ৬০
৮। জীবন যখন যেমন ৭০
৭। দহন ৮৩
১০। লগেন ৯২
১১। সালিশ ৯৮

না .....?

১

রক্তে ভেজা গলি থেকে রাজপথ। রক্তের কতরূপ এখানে! কী উল্লসিত তার বিচরণ! চারপাশে কেউ নেই রক্ত ছাড়া। কোথাও কোথাও রক্তের মাঝে বিধ্বস্ত মগজের টুকরোগুলো আলোর ঝলকানিতে চিকচিক করছে। দু'-এক জায়গায় রক্তের গতরে কালো বেশ।

একটি গাড়ী এসে থামলো গলি ও রাজপথের মিলনস্থলে। সেনা-পোশাক পরিহিত একটা লোক নামলো গাড়ী থেকে। বুটের খটখট আওয়াজ তুলে আসছে গলির ভিতর। জমাটবাঁধা রক্ত দেখলেই সে সজোরে লাথি মারছে আর দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করছে– Bastard ! বুটের আঘাতে রক্ত ছিটকে পড়ছে দু'পাশের বাড়ীর দেয়ালে। দেয়ালের গায়ে অজস্র ফোঁটা দেখে মনে হচ্ছে এ দেয়াল নয়, এ যেন লাল পাথরে গড়া এক অনন্য কীর্তি! রক্তের বুক চিরে অগ্রসরমান বুটজোড়া যেন রক্ত দিয়েই তৈরী! লোকটি গলির মাঝামাঝি এসে থামলো। বাঁ দিকের বাড়ী থেকে একজন এসে তাকে ভেতরে নিল।

রাত প্রায় তিনটা। শিউলীর ঘুম আসছেনা। চার দিক থেকে ভেসে আসছে গুলির শব্দ। এই শব্দে সে ভীত নয়। সে পাকিস্তানী এক প্রতাপশালী সেনা অফিসারের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। সে জানে সব বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হলেও অক্ষত থাকবে সে। সে জানতো দেশের পরিস্থিতি ভাল নয়। কিন্তু হঠাৎ আজ মধ্যরাতেই বাংলার মাটিতে গর্জে উঠবে শত্রুর কামান, লক্ষ-লক্ষ মানুষ হবে গৃহহারা, নর-নারী-শিশুর চিৎকারে কেঁপে উঠবে আকাশ-বাতাস, রক্তে লাল হবে এই সবুজ বাংলা-সে একবারও ভাবেনি। সে এখন পরিস্কার বুঝতে পারছে কেন তার স্বামী, তার ভাসুর তাকে গতকাল নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে, এমনকি তার পিতাও। "তারা আমাকে বলেনি কেন ? তার মানে, তারা আমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু আমার জন্মদাতা পিতা ? সেও!"– সে এটি ভাবতে ভাবতে একসময় হেসে উঠে। চোখের কোণ বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অবলীলায়। আনন্দের ঝলকে মনের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠলো। মনে মনে বলে, "অমি আমার মায়ের কোল ছেড়ে যাইনি। আমার অজান্তেই ভালবেসেছি মাকে। ভালবেসে পাকিস্তানীকে বিয়ে করেও পাকিস্তানী হইনি।" আবারও ভাবে, "আমাকে শত্রু ভাবলে ওরা পাকিস্তানে নিতে চেয়েছিল কেন ? সেখানে আমার

ভাবনার, আমার চাওয়া-পাওয়ার কোন গুরুত্ব থাকবেনা বলে ? আমার বন্দী চেতনার চিৎকার কেউ শুনবেনা বলে ? হ্যাঁ তাইতো..... এটাইতো স্বাভাবিক!" কিন্তু তবুও তার ভাবনা ফুরায়না। কোথাও যেন একটা সংশয় উকি মারছে মনের অতলে। সে স্থির হতে পারছে না। হঠাৎ তার দৃষ্টি ফিরলো, সংশয় কোথায় যেন পালালো, মন হলো ফুরফুরে, সন্দেহের সব জাল ছিন্ন করে জন্ম নিল চূড়ান্ত বিশ্বাস–পেটে হাত রেখে ঈষৎ হেসে বলে, "আমাকে তোমাদের প্রয়োজন হয়তো আছে, হয়তোবা নাই, কিন্তু একে তোমাদের বড় প্রয়োজন।"

২৬শে মার্চই শিউলীর সন্তান প্রসবের তারিখ নির্ধারণ করেছেন ডাক্তার। তবে ২৫শে মার্চ রাতের সম্ভবনাটুকু তিনি একদম উড়িয়ে দেননি। এখন ২৫শে মার্চ গড়িয়ে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহর। সেই বিকাল থেকে একজন ডাক্তার ও একজন নার্স সব ধরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে অবস্থান করছেন এ বাড়ীতে। ডাক্তার কিছুক্ষণ পরপর এসে শিউলীর সঙ্গে কথা বলছেন, অবস্থা মাপযোগ করছেন। তারা শিউলীর পাশের রুমেই অবস্থান করছেন। নার্স সব সময় থাকতে চাইছেন কাছে, কিন্তু শিউলীর আপত্তিতেই উনি তা পারছেন না। এ মুহূর্তে তার পাশে থাকার মত আপনজন বলতে বাবা আর ভাই, কিন্তু তারা এখন কোথায় সে জানেনা। নেই কোন বোন, আর মা'তো সেই বছর তিনেক আগে যাত্রা করেছেন পরপারে। অন্যান্য দু-চারজন আত্মীয়-স্বজন বলতে যারা আছে তারা সবাই গ্রামে থাকে। তার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ থাকায় তারা ঢাকা শহরে আসলেও এ বাড়ীতে পা রাখেনা। স্বামী-বেচারা বউকে সঙ্গে নিতে ব্যর্থ হয়ে ভাইয়ের আদেশে সকালেই ত্যাগ করেছে বাংলা। প্রসব-সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা তার ভাসুরই করেছেন। সন্ধ্যা বেলা পিতা তার হাতে একটি পিস্তল দিয়ে বলেছেন "মা, এটা রাখ। দেশের অবস্থা ভাল নয়। লুটতরাজদের দৌরাত্ম বেড়েছে। আমি ব্যস্ত মানুষ, কখন কোথায় থাকি, ঠিক নাই।"

২

কিছুক্ষণ হলো হালকা ব্যথা শুরু হয়েছে। শিউলী ডাক্তার বা নার্সকে এখনো জানায়নি। সে খাটের বাতায় বালিশে হেলান দিয়ে ভাবছে বাবা আর ভাইয়ের কথা, 'আপনজন এত নিষ্ঠুর হতে পারে!" ঘণ্টাদুয়েক আগে সে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেছে সাত-আটজন মানুষকে চোখ বেঁধে গুলি করে মারার দৃশ্য। সেই সময় কোথা থেকে এক টুকরো আলো তাদের চোখে-মুখে পড়েছিল। তখন তাদের চেনার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু চোখ বাঁধা থাকায় তা সম্ভব হয়নি। ঐ দৃশ্য দেখার পর থেকেই তার মাথা

ঝিমঝিম করছে, হঠাৎ ঝাঁকি মেরে উঠছে শরীর, হাত-পা কেমন যেন হিম হয়ে আসছে, চোখের প্রাচীর ভেদ করে জল ঝরছে নীরবে। দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে সে স্থির হয়ে আছে। এমন সময় ভেসে এল চিৎকার। নারীর কণ্ঠ। সে চমকে উঠে। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ব্যথা আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে। দু'হাতে পেট ধরে সে ধীরপায়ে এসে দাঁড়ালো জানালার কাছে। পর্দা সরিয়ে এদিক-সেদিক দেখার চেষ্টা করছে। দোতলায় অবস্থান করায় চারপাশ লক্ষ্য করতে সুবিধাই হচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার থাকায় সে কোনকিছুই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না। এমন সময় ঝলসে উঠলো একটি টর্চ। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার নিভে গেল। সে তিনজন লোকের অবস্থান পরিস্কার বুঝতে পারলো। পাশের বাড়ী। একেবারে তাদের দেয়াল ঘেঁষে বাড়ীটির প্রাচীর। হিন্দুর বাড়ী। একতলা বাড়ী। বেশ কিছু জায়গা নিয়ে বাড়ীটির অস্তিত্ব। বড় আঙ্গিনা। ঐ আঙ্গিনাতেই দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। তিনজনের দু'জনকে সে চেনেনা, কিন্তু একজনকে খুব ভালভাবেই চিনতে পেরেছে। তাদের পাড়ার নিজাম চাচা। মসজিদে তিনি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষা দেন। সে অবাক হয়ে ভাবছে, 'উনি কী করছেন এখানে এসময় ? মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর উনি এখানে.....! তাহলে কি উনি .....! আজ সন্ধ্যার পরতো উনি আমাদের নিচতলায় আব্বার সঙ্গে বসে কী যেন আলাপ করছিলেন– তাহলে আব্বাও কি এখানেই আছে ?" সে খুব ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু অন্ধকার তাকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। আবারও লাইট জ্বলে উঠলো। চল্লিশোর্ধ এক পুরুষ আঠার-বিশ বছরের এক উলঙ্গ মেয়েকে ঘর থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করে লাথি মেরে ফেলে দিল, দাঁতে দাঁত চেপে বললো– 'Bastard! I destroyed your freedom!' লাইটের সরু আলোয় পুরুষটিকে চিনতে তার কোন ভুল হয়নি, মেয়েটিকে তো নয়ই। পুরুষটি আর কেউ নয়, তার স্বামীর বড় ভাই, তার ভাসুর, পাকিস্তানী আর্মির প্রতাপশালী এক অফিসার। আর মেয়েটি তার স্নেহের, অতি আদরের-একদিনের নয়, দুই দিনের নয়, দীর্ঘদিনের আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ ঐ বাড়ীর একমাত্র মেয়ে শ্রীমতী নন্দিতা রায়। সে মুখ ঘুরিয়ে জানালায় ঠেস দিয়ে দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।

চেক-আপ করার জন্য ডাক্তার ঢুকলেন ঘরে, সঙ্গে নার্সও। শিউলী জানালা ছেড়ে বিছানায় আসলো। এতক্ষণ ব্যথার কথা সে প্রায় ভুলেই ছিল। ব্যথা এসময় অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে। সে বুঝতে পারছে, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

"ম্যাডাম' আমার মনে হয় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, আপনি ডাকেননি কেন আমাকে ?" ডাক্তার বললেন।

'হ্যাঁ, ব্যথা হচ্ছে। এখন আপনাদের এখানে থাকা প্রয়োজন, আমি বুঝতে পারছি। তারপরও আমাকে একটু একা থকতে দিন, আমি ডাকবো আপনাদের।"

"কিন্তু আপনিতো ব্যথায় কাঁদছেন। তাছাড়া বাচ্চার অবস্থান বুঝারও চেষ্টা করতে হবে– প্লিজ, ম্যাডাম আমাদের দেখতে দিন।'

"ডক্টর, দয়া করে আর কোন কথা বলবেন না, Please! আমি সমস্যা বুঝতে পারছি, আপনারা হয়তো আমার চেয়েও আরও ভাল বুঝতে পারছেন, তারপরও ..... Please! সে দু'হাত জোড় করল।

ডাক্তার ও নার্স পাশের রুমে গেলেন। এরই মধ্যে ব্যথা পৌছে গেছে চরম পর্যায়ে। সে কোনভাবে তাদের সামনে চুপচাপ ছিল। ব্যথার জ্বালা কণ্ঠ-চিরে আসতে চেয়েছে বাইরে, কিন্তু সে দমন করেছে নিষ্ঠুরভাবে। সে খাটের বাতায় পরপর তিনটি বালিশ উঁচু করে তাতে হেলান দিল। অনেকটা বসে থাকার মতই। সহ্য হচ্ছে না আর ব্যথা। জোরে চিৎকার দিতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু ডাক্তার আর নার্সের কারণে পারছে না। তবুও অপ্রতিরোধ্য উহ্..... আহ্..... শব্দগুলো বের হয়ে আসছে অনায়াসে। সে নাক-মুখ চেপে ধরে আছে যাতে ডাক্তার বা নার্স শুনতে না পায়। সে এ মুহূর্তে কিছুটা বে-সামাল হয়ে পড়েছে। একদিকে অসহনীয় ব্যথা, অন্যদিকে ভাসুর, স্বামী, বাপ-ভাই, নন্দিতা, চোখ বাঁধা মানুষগুলি, রক্ত... এগুলোর প্রত্যেকটি তার মাথায় একেকটি ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে আঘাত করছে।

স্বামী সন্তান নিয়ে শিউলীর বাস করার স্বপ্ন অনেক পুরনো। বিয়ের পর থেকে এই একটি মাত্র স্বপ্নের উপর ভর করে সে দিন পার করে আসছে। এক দিকে স্বামীর প্রেম, অন্যদিকে নব-নব জয়ধ্বনি তুলে যে অতিথি আসছে তার প্রতি প্রখর আকর্ষণ এবং ভালবাসা... এ দুয়ের মাঝে আমৃত্যু অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় অবস্থান করে তাদের বুকে আশা জাগিয়ে, অন্তরে মানসিক শক্তি জুগিয়ে, ভালবাসায় হৃদয় ভরিয়ে তুলে সে চলতে চায় সামনের পানে। সে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পেটের দিকে। মনের মাঝে নিঃশব্দে ধ্বণিত হচ্ছে, "সোনামণি, তুই আসবি বলেই আমি এসেছি এই পৃথিবীতে। মা বলে ডাকবি বলেই আমি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি নারীত্ব। তোর হাসি আমার স্বর্গ, তোর কান্না আমার নরক। তোর ক্ষণে-ক্ষণে বেড়ে উঠা আমার অনাবিল প্রশান্তি। তোর হাত ধরে এগিয়ে যাব দূর থেকে দূরে ..... যা শুনিনি তাই শুনাবি, যা

দেখিনি তাই দেখাবি।" হাসিমাখা ঠোঁটে সে বন্ধ করলো দু'চোখ। নিরবে ক'ফোঁটা জল ঝরে পড়লো দ্রুতগতিতে।

অনবরত ঝরছে গুলি। ঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নারী-পুরুষ আর শিশুর গলা ফাটানো চিৎকার। কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করছে জীবন বাজি রেখে। ওরা কেউ পালাচ্ছে না– মনে হচ্ছে গুলির বিরুদ্ধে এ এক জলন্ত প্রতিবাদ !

শিউলী হঠাৎ সজোরে চিৎকার দিয়ে উঠে, 'না.....?' ছুটে আসে ডাক্তার, আসে নার্স। শুধু এলনা বাড়ীর দরজায় পাহাড়ারত দু'জন পাকিস্তানী সেনা।

মিনিট বিশেকের মধ্যেই বাংলার মাটিতে পা রাখলো ফুটফুটে, হৃষ্ট-পুষ্ট এক আদম সন্তান। ডাক্তার মায়ের পাশে শুইয়ে দিয়ে বললেন, "ম্যাডাম, আমার বিশ্বাস, এ ছেলে একদিন বড় কিছু হবে, বাবা-মার মুখ আলোকিত করবে।"

শিউলী উঠে বসলো। দু'চোখ তার স্থির হলো সন্তানের উপর। কিছু সময় পর তোশকের নিচ থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালাল ছেলের বুকে। ডাক্তার ও নার্স এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন– ম্যাডাম ? গুলির শব্দে দুই সেনা উঠে এল উপরে। ভাসুর, নিজাম চাচাসহ আশপাশ থেকে অন্যান্য সেনারা ছুটে আসছে এ বাড়ীর দিকে। টেলিফোনে বেজে চলেছে অনবরত ক্রিং-ক্রিং শব্দ।

পারের ডাক

১

সূর্য অস্তগামী। তার দিনের শেষ লাল আলো এসে ভর করেছে দীননাথের নৌকার ওপর। গতকালই নৌকাটিতে আলকাতরা লেপেছে দীননাথ। এতে কাল রং তার অস্তিত্ব কিছুটা হারালেও লাল রং যে একদম বীরদর্পে অবস্থান করছে তা নয়– উভয়ের মিলনে এক আলাদা রংয়ের জন্ম হয়েছে। মোটামুটি আকর্ষণীয় এ রং। আর সে জন্যই বোধ হয় জনচোখ তা এড়াতে পারছে না। তারা নৌকাতে করে পার হওয়ার সময় একবারের জন্য হলেও দৃষ্টি ফেলছে নৌকার গতরে।

আজ দীননাথের মন আনন্দে ভরা। এই আনন্দের সীমা পরিমাপ করা কঠিন। সে নিজেও হয়তো জানেনা তা। সে আজ হাটে যাবে। সপ্তাহে আশপাশ মিলিয়ে মোট তিনটি হাট বসে। এর মধ্যে একটা কাছে। বাকী দুইটি মাইল এক-দুয়ের মধ্যে। প্রতিটি হাটেই তার চরণধুলি পড়ে প্রতি সপ্তাহে। তবে মানুষ যখন সাধারণত হাট থেকে ফিরে তখন হয় তার যাওয়ার সময়। মানুষ যায় বাজার করতে। সে যায় মূলত পান করতে। মানুষ বাজার করে রাতে খাওয়ার জন্য। আর সে হাট থেকেই পেট পুরে ফেরে। বাজার তার হাতেও থাকে কিন্তু তার স্বাদ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ছেলেমেয়েরা। তার বাড়ীতে রান্না চুলোয় চড়ে সাধারণত রাত এগারটার কাছাকাছি সময়ে। প্রতিটি হাট থেকেই সে রাত দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ফিরে। আজ ফতেহগঞ্জের হাট। বাড়ী থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। এই হাটে রাতের বেলা বসে তাড়ির আড্ডা। গভীর রাত ধরে চলে এ আড্ডা। আজ সেখানেই তার মন ছুটে গেছে সেই সকালের ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে। আনন্দের সীমা বেড়েই চলেছে সূর্য যতই পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। সে গান গেয়ে চলেছে একের পর এক।

নৌকা পারাপারের কারবার দীননাথের। শুধু তার নয়, তার বংশের পাঁচ পুরুষ ধরে এ কর্মসাধন চলে আসছে একে একে হাত বদল হয়ে। তার আগে তার বাবা হাল ধরেছিল। এইতো বছর দুয়েক হল হালের দায়িত্ব একমাত্র ছেলে দীননাথের ওপর ছেড়ে দিয়ে পরপারে যাত্রা করেছে। নৌকার কাজ হচ্ছে এপার থেকে ওপার যাওয়া, আবার ফিরে আসা। এ কর্মটি দীননাথের ভাল লাগে না। সে মাঝে-মাঝে হাল ছেড়ে বসে থাকে। কিন্তু উপায় কী ? আরতো নেই কোন কর্ম। এক ছটাক জমিও নেই তার। ঘরে বউ, দুই ছেলে, দুই মেয়ে। সংসার চলে না। কষ্টের প্রচণ্ড দাপট। খাবার থাকে

তো কাপড় থাকে না, কাপড় থাকে তো খাবার থাকে না। সর্বোপরি তার আবার নেশার কষাঘাত। দু'বেলা ভাত না হলেও সমস্যা নাই, কিন্তু তার মাল চাই। মালের অনেক অর্থ থাকলেও তার কাছে একটাই অর্থ– তাড়ি। তালের তাড়ি। অন্য কাজকর্ম এলাকায় আছে-মানুষের জমির কাজ, মাটি কাটা, ইটের ভাটায় কাজ, ভ্যান চালানো। সে একবার বউ-এর ওপর নৌকা ঠেলার কাজ ছেড়ে দিয়ে শহরে গিয়েছিল। রিক্সা চালানো থেকে শুরু করে দোকানে দোকানে বিভিন্ন কাজকর্ম সে করেছে মাস খানেক। কিন্তু ঐ মাস পর্যন্তই। কোথাও মন বসাতে না পেরে ফিরে এসেছে। এলাকার কাজকর্মেও মন বসানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তাই আবারো ফিরে এসেছে মানুষ পারাপারের কর্মে। বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও শারীরিক দিক দিয়ে সে দুর্বল। সে জানে যে, নেশাই তার এই দুর্বলতার জন্য দায়ী, তারপরও এক মুহূর্তও ভুলে থাকতে পারে না সে নেশাকে। যেন তার বন্ধু! যেন আত্মার আত্মীয়! মন খারাপ হলেও ভবিষ্যতের পৃথিবীতে দৃষ্টি মেলে সে পরিস্কার দেখতে পায়, তার জীবনে আর অন্য কোন আশার আলো নাই–নৌকাই তার জীবন, নৌকাই তার মরণ। তার পরিবারে আর কোন আয় নাই, এই নৌকার ওপর ভর করেই চলে ছয়-ছয়টি জীবন।

রাত্রি এগারটার কিছু পরে দীননাথ ফিরলো বাড়ীতে। ছেলে-মেয়ে সবাই না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে। বড়টির বয়স বড়জোর হবে এগারো। মেয়েই বড়। পরেরটি ছেলে এবং তারপর পিঠাপিঠি মেয়ে আর ছেলে। হাটবারের দিন এরা অবশ্য রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করেনা। সকালেই চলে এদের রাতের আহার। দীননাথের স্ত্রী সেই সাঁঝবেলা থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে বাজারের অপেক্ষায়। গ্রামে বিদ্যুৎ থাকলেও অর্থের অভাবে তার বাড়ীতে পৌঁছেনি। দীননাথও কারো কাছে অনুরোধ করতে যায়নি। অন্যদিকে গ্রামের লোকজনেরও কারো মাথা ব্যথা নাই এ আঁধার নিয়ে।

'একেবারে সকালেই ফিরবে ? দীননাথের স্ত্রী রাগের স্বরে বলল।

'ক্যা ? 'হামার বাড়িত যকুন ইচ্ছা তকুন ফিরমু, তুর কী?' দীননাথ টলতে টলতে বলল।

'তুমি একটা মানুষ! চ্যাংড়া-চেংড়িরা প্রত্যেক হাটের অ্যাত্রে না খাইয়া সুতে, তুমার লজ্জা লাগেনা ?'

'ঐ মাগি! কতা কোস্‌না ? ভাত আন্দেক ? তুরতো লাগে না! ইনকাম করতে ক্যামন ঠ্যালা তার তুই কী বুজবু ?'

'হুঁ----! কত ইনকাম! এই কাম তো হামিই করবার পারি! এডার জন্য আবার পুরুষের দরকার হয় নাকি ?'

'হুঁ---! বুজিতো মাগী! তুই লাউ ঠেলবু আর দশ জনাক শরীল দ্যাকাবু ?'

'সেডা করলেতো সব সুময়ই করবার পারি-তালে আর এত কষ্ট সহ্য করনুনানি ? অন্য কাম করার মুরত নাই, এ্যাকুন হামার শরীল লিয়া টানাটানি! তুমার ঐ তাড়ি খ্যাতেই তো ব্যাবাক টাকা শ্যাষ হ্যয়া যায়।'

'থাম মাগী ? তুই কী বুজবু ? মাল খাওয়া হামাকেরে বংশের গৌরব। এডা খামুই। হামার বাপ খাছে, তার বাপ খ্যাছে, তার বাপ খ্যাছে, তার ..... তুই গ্যণা শ্যাষ করবার পারবুনা। হামি খাত্তি, হামার ব্যাটাও খা.....বে!' শেষের শব্দটি আর আগেরগুলোর মত উচ্চারিত হল না। শেষ বাক্যটির শেষ প্রান্তে বসে পড়লো দীননাথ। শরীরটা খুব ভার লাগছে তার। আজ পরিমাণ একটু বেশী পড়েছে। গোটা শরীর টলবল করছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। ছেলেমেয়েরা জাগা পেয়েছে। তবে আবারও ঘুমানোর চেষ্টা করছে। তারা ঘর থেকে কেউ বের হয় না। তারা জানে এটা নিত্যদিনের ব্যাপার। কাজেই ঘুম তারা নষ্ট করতে চায় না। অন্যদিকে জেগে থেকে আর লাভ কি ? সেই প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর শেষ হবে রান্না। তাই হাটবারের দিন ক্ষুধা নিয়ে রাত কাটানো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

স্ত্রী আর কোন কথা বলে না। কাঁদছে শব্দ করে। রান্নার তেমন কোন অয়োজন নাই। ভাতের সঙ্গে হবে আলু ভর্তা আর ডাল। এই আলু ভর্তা বা ডালে কোন আপত্তি নাই স্ত্রীর। সে সবকিছু মেনে নিয়েই এ সংসারে আছে। তিনবেলা কোনভাবে একটু ভাত জুটলেই সে খুশী। সে খাক না-খাক, ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত থাকে। স্বামীর প্রতিও তার শ্রদ্ধার যেমন কমতি নাই তেমনি ভালোবাসারও। সে স্বামীর আর কোন দোষ খুঁজে পায় না একমাত্র তাড়ি খাওয়া ছাড়া। এটা ছাড়ানোর জন্য সে সব সময় চেষ্টা করে, কিন্তু মাত্রা আরও বেড়ে চলেছে। এই কিছুদিন আগে তার বাবা-মা এসেছিল তাকে নিয়ে যেতে, সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরকেও। কিন্তু স্বামীকে ফেলে সে যেতে চায়নি। তার বরাবরই এক কথা, "হামার স্বামী ভাল মানুষ। তাক ছ্যাড়া হামি কুন্টেও যামুনা।"

চাল ধুতে ধুতে সে চাইলো স্বামীর দিকে। দীননাথ শুয়ে পড়েছে মাটির উপর– একেবারে নিথর। স্থির হলো দু'চোখ; উতলা হলো মন-হারালো স্মৃতির অতলে। স্বেচ্ছায় সে বউ হয়ে এসেছে এ সংসারে। তার বাবা-মা রাজি ছিল না। কিন্তু তাতে

কি ? সেই ভালোবেসে বিয়ে করেছে দীননাথকে। একবার দীননাথ গিয়েছিল হিজলপুর গ্রামে। তার বাড়ী থেকে কিলোদশেক দূরে। সেখানে গিয়েছিল এক মালিকের মালামাল পৌঁছে দিতে। তখন তাদের দুটো নৌকা ছিল। একটা মাঝে-মধ্যে ভাড়া খাটতো। ঐ কর্ম দীননাথ করত। স্ত্রীর বাড়ী সেই হিজলপুর গ্রামে। তাদেরও নৌকা পারাপারের কর্ম ছিল, এখন অবশ্য নাই। বাবা-ভাইরা মিলে গঞ্জে তরিতরকারির দোকান করে। এতে কোনভাবে জীবন পার হয়ে যাচ্ছে। দীননাথের নদীই হিজলপুরের গা ঘেঁষে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় এই স্ত্রী বাবা-ভাইয়ের অবর্তমানে নৌকা পার করছিল। দীননাথ সেই ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে শুয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল। একপর্যায়ে স্ত্রী কাছে আসে, নাম-ধাম, কর্ম জিজ্ঞাসা করে। তারপর আরও কয়েকবার যায় দীননাথ ঐ গ্রামে। এভাবে একসময় দুজন দুজনার ভালোলাগা বুঝতে পারে। তারপর একদিন লাল শাড়ি পড়িয়ে তাকে ঘরে এনেছিল দীননাথ। দীননাথ নৌকার উপর বসা, হাতে বাঁশি; স্ত্রী নৌকার নিচে দাঁড়িয়ে, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পানির নিচে-এক সময় দীননাথ তাকে হাত ধরে নৌকায় তুলছে-সেই দৃশ্য মনে হলেই সব দুঃখ ভুলে যায় স্ত্রী। আজ এখনো হেসে উঠে চোখ মুছলো সে। ভেতর-বাইর সবখানে লেগেছে খুশির ছোঁয়া। এখন কোন দুঃখ নাই তার। নাই কোন ক্ষুধার জ্বালা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী স্ত্রী সে।

চুলায় ভাত-চাপিয়ে সে স্বামীর কাছে আসলো। দীননাথ ঘুমিয়ে পড়েছে। স্ত্রী মাথার চুলে হাত বুলাচ্ছে। সারা শরীরের ময়লা ঝেড়ে ফেলছে। সে মাটির ওপর শুয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব মাতালদের বোধ হয় এই একই চিত্র। এরা কোথায় ঘুমাবে, কখন ঘুমাবে তা তারা জানেনা, জানেনা তাদের সামনে-পেছনে-ডানে-বামে কোন বিপদ লুকিয়ে আছে কি-না। স্ত্রী ধাক্কাধাক্কি করে কোনভাবে আধোঘুমে ফিরিয়ে এনে নিজ কাঁধের ওপর সমস্ত ভার নিয়ে স্বামীকে ঘরে নিল। চৌকির ওপর শুইয়ে দিয়ে স্ত্রী হাসিমুখে আবার ফিরে এল রান্নার কাজে।

২

আজ সোমবার। হাটের দিন না থাকায় আজ দীননাথ সারাদিন নৌকার উপরেই ছিল। রাতের অংশটাও কেটেছে একইভাবে। সাধারণত রাত এগারটার পর আর পার করার নিয়ম নাই। এই নিয়ম কোন আইন দ্বারা তৈরী নয়। এলাকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এনেই এরকম নিয়ম তৈরী হয়েছে। লোকজনই এমনটা করেছে। আসলে এ সময়ের পর কেউই পার হতে আসেনা। তবে বিপদের কথা আলাদা। দীননাথও সে ব্যাপারে সবসময় সজাগ।

এখন সেই সময়। রাত এগারটা পার হয়েছে। দীননাথ ঘাটে নৌকা বেঁধে বউকে নিয়ে বসেছে নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ের উপরেই তার বাড়ী। দুটো মাত্র ঘর বাড়ীর সম্বল। একদম নদীর কূল ঘেঁষে বাড়ী হওয়ায় নদীই তার নিকটতম প্রতিবেশী। সে কোন কোন রাতের ভোর পর্যন্ত এই কূলে বসে কাটায়। রাতের আকাশ তার খুবই প্রিয়। জোছনার রাত হলেতো কথাই নাই। রাতের আকাশে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুরই সাক্ষী সে। আজ সে স্ত্রীকে নিয়ে বসেছে গল্প করার জন্য।

'মালতী তুক কষ্ট দিই হ্যামি, লয় ?' দীননাথ লজ্জাভরে বলে। মালতী তার স্ত্রীর নাম। পুরো নাম শ্রীমতি মালতী রানী।

মালতীও লজ্জিত হল কিছুটা। সে তৎক্ষণাৎ স্বামীকে কোলের মধ্যে টেনে নিল।

'কী কও! কুনো কষ্ট তুমি হামাক দ্যাওনা। হ্যামি জানি, তুমি হামাক খুব ভালবাস।'

দীননাথ বুঝে, স্ত্রী তাকে মিথ্যা বলছে। এই মিথ্যা বলার কারণও সে জানে-এটি আর কিছুই নয়,তার প্রতি ভালবাসা।

'বউ তুই হামাক খুব ভালবাসিস, আর এ জন্যেই তুই হামার ব্যাবাক অত্যাচার ম্যানা লিস, তাই লয় ?'

'তুমি ছাড়া হামার কে আছে এত আপন! তুমি খুব ভাল মানুষ। খালি তাড়ি খাবার পর তুমি ব্যোদলা যাও, হামাক গ্যালাগ্যালি করো। এডা তুমার দুষ লয়, ঐ তাড়িই তুমাক অমন বানায়।'

'মালতী, তুর মতন একটা বউ পাছি এডা হামার চোদ্দ পুরুষের সুভাগ্য! নিশার সুময় তুক কী বুলি হামার ওগলা খিয়াল থাকে না। যকুন নিশা ক্যাটা যায় তকুন তুর মুক দেক্যাও কিছু বুঝবার পারিনা, তুই হাসিখুশী থাকিস। বিশ্বাস কর, হ্যামি তুক হামার জীবনোত থ্যাকাও বেশী ভালবাসি।'

মালতীর চোখে পানি চলে এসেছে। কণ্ঠও হয়েছে একটু ভার।

'সেই জন্যই তো বুলি, তাড়ি না খ্যালে কী হয়? জানো, একবার ভাবি, তুমার সাতে আর কতা কমুনা, সারাক্ষুণ আগ কোর‍্যা থাকমু। কিন্তু তুমার মুকের দিকে তাকালে আর পারি না। এডা খাওয়া বাদ দাও।'

'হ্যামিও তাই ভাবি, বাদ দিমু। বিশ্বাস কর, পতিদিন একবার ক্যোরা মনে মনে কই, আর খামুনা, কিন্তুক পারিনা। এবার থ্যাকা খুব চেষ্টা করমু বাদ দ্যাওয়ার।'

স্ত্রী মনে মনে বলে, "ভগবান তুমি ছাড়া অক কেউ ছাড়াবার পারবেনা, উঁই ক্যালকা আবার খাবে।"

'ব্যাটাবিটির লেকাপড়ার কতাতো ভাবোইনা। কতবার বুলি অরকেরে দিকে তাকাও। বড় মিয়াডারতো পড়া হলইনা। ছুট্টু দুডাওতো স্কুলোত যায়, যায়না। হামাক দেকা ভয় করেনা অত, তুমি শাসন করলেই অরা পড়বে।'

"শাসন ক্যোরা কী করমু? গরীবের আবার লেকাপড়া! শুন বউ, ছেলে দুডা বড় হলেই অরকেরোক শহরোত পাটামু, দোকানোত কাম করবে, তারপর অবস্থা এ্যানা ভাল হলে হামরা দুই জনও চ্যোলা যামু-এই লাও ঠ্যালার কাম আর করমুনা!"

স্বামীর এই যুক্তি মালতীর মন স্পর্শ করলনা। তার সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সাক্ষাৎ ঘটেনি। তারপরও তার বুঝতে কোন দ্বিধা হয়না যে, লেখাপড়া ছাড়া ওরা মানুষ হবে না। স্ত্রী এ বিষয়ে তার যুক্তি তুলে ধারার জন্য ঠোঁট মেলতেই দীননাথ বলে উঠে "এগলা বাদ দে। ভাল কতা বুল। অ্যাজকা দুইজনে হামাকেরে কতা কমু।'

মালতী এ বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ না করে স্বামীর ইচ্ছাকে সঙ্গ দিয়ে বলে, "আচ্ছা।" নিজে খুশী হতে পারলনা, কিন্তু স্বামীর আনন্দকে প্রতিহত করলনা।

জোছনা মেঘের খপ্পরে পড়ছে বারবার। মেঘের রং কালো। জোছনা যখন মুক্তি পাচ্ছে যেন প্রচণ্ড প্রেমের টানে এসে বসছে মালতীর মুখে। চেনা অনেকটাই মুশকিল হয়ে পড়ছে– চাঁদ না মুখ। দীননাথ যদি এখন একবার অন্তরদৃষ্টি নিবদ্ধ করতো এই মুখে, বোধ হয় সে পারতো না স্ত্রীর চাওয়াকে ফিরিয়ে দিতে।

"মালতী তুর জন্য একটা শাড়ী কিনমু। কয়দিন থ্যাকা আশা ক্যোরা আছি। ট্যাকাই মিলাবার পারিত্তিনা।"

দীননাথের মুখ অন্ধকার-অন্ধকারে নয়, বেদনায়। এখন মেঘের রং তার মুখের রংয়ে কোন বেশকম নাই।

মালতীর ভালবাসা ফুলে উঠলো। ঠিক বর্ষাকালের নদীর বাড়ন্ত পানির মতো। কজির জোরও বৃদ্ধি পেল ভালবাসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। দীননাথ প্রবেশ করল মালতীর বক্ষ মাঝারে।

"ট্যাকা কুন জাগাত পাবে ?"

"বউ, হ্যামিতো পাগল। প্রায় সুময় তাড়ি খ্যায়া মাতাল থাকি। তারপরও যকুন ভাল থাকি তুক লিয়া ভাবি। ট্যাকা জমাছি। একশ চল্লিশ ট্যাকা। আর লাগবে বিশ ট্যাকা। তালে হামার পছন্দের শাড়ি হোবে। জানিস মালতী, এই বিশ ট্যাকার জন্যে সেংক্যা গেছনু লস্কর বাবুর কাছে। কনু, বাবু বিশটা ট্যাকা হাওলাত দ্যান, সাতদিনের মদ্যেই দিয়া দিমু। বাবু হামাক তিন ট্যাকা দিয়া কোলো, এডা লিয়া যা, এক গিলাস

তাড়ি হোবে, ফ্যারৎ দ্যাওয়া লাগবেনা। হ্যামি চ্যোলা আলছি। ট্যাকা না ল্যাওয়ায় বাবু ক্ষেপা গেছে। আর কারো কাছে যাইনি।"

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে উঠলো মালতীর দু'চোখ। যে দিন ঘোমটা দিয়ে সে পা রেখেছে দীননাথের ঘরে সেদিন থেকেই তার পরিচয় চোখের জলের সঙ্গে। এই জলের সঙ্গে খেলা করতে করতে তার পার হলো চৌদ্দটি বছর, কিন্তু আজকের জলের সঙ্গে তার এমন করে কখনো দেখা হয়নি-এ জল কষ্টের নয়, ক্ষোভের নয়, এ যে দীননাথের ভালবাসার জল। মালতী দেখলো, বুঝলো– 'ভালবাসা' নামে যে বিশ্বাসের উপর ভর করে সে এতটা পথ পার হয়েছে তার একবিন্দুও লুটিয়ে পড়েনি পথের ধূলায়, এক বিন্দুও হয়নি পদদলিত। দু'ফোঁটা জল এসে পড়ল স্বামীর মুখে। সে তাতে এতটুকুও বাধা দিলনা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এক নিশ্চল পাথর, কিন্তু প্রাণময়; পুরো হৃদয় তার আলোয় উদ্ভাসিত; দীননাথের প্রেমের কাছে সে আজ পরাজিত-দীননাথের স্পর্শ ছাড়া বোধ হয় সে আর সাড়া দেবে না।

দীননাথ লাফ দিয়ে উঠে। চোখ রাখলো স্ত্রীর চোখে। কিন্তু যে বিস্ময় নিয়ে সে মালতীর বক্ষ থেকে বরে হয়ে আসলো, সামনে উপস্থিত এই বিস্ময় তাকে ঢুকিয়ে দিল বক্ষের একেবারে অতলে। স্ত্রীর চোখে অশ্রুর মেলা, অথচ মুখে হাসির বন্যা। স্ত্রীর এই হাসি আর অশ্রু চিনতে এতটুকু দেরী হলনা তার– এ যে হাসি নয়, অশ্রু নয়– এ যে ভালবাসা।

দুজনার দৃষ্টি এখন দুজনার ওপর স্থির হয়েছে। দীননাথের বিস্ময়ের যেমন শেষ নাই, তেমনি শেষ নাই মালতীর হাসির। ওদিকে মেঘ কেমন যেন ধীরে ধীরে বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠছে। আরো কাল হয়ে উঠেছে সে। যেন ধেয়ে আসছে এদের দিকে। জোছনা একটু সুযোগ পেলেই অবস্থান নিচ্ছে এদের মাঝে, আলো বিলাচ্ছে উদার হয়ে। কিন্তু প্রায় সময়ই অন্ধকারের উপস্থিতি। জোছনার যুদ্ধ শুরু হয়েছে মেঘের সঙ্গে। কিন্তু তা স্থায়ী হচ্ছে না। ফলে জোছনা বলতে গেলে একরকম বিদায়ই নিচ্ছে। অমাবশ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর এ অন্ধকার। খুব কাছে থেকেও ভাল করে চেনা যায়না কোন কিছু। কিন্ত এ দম্পতি কী দেখছে ? সত্যিই কি কিছু দেখছে ? আর দেখছেইবা কেমন করে ? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের ভার এদের নিয়ন্ত্রকের উপরই রইলো। তবে এ ধারনাটা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, এরা আর দৃষ্টির মাঝে নাই, এরা এখন মনের মাঝে; মনের চোখ দিয়ে দেখছে পরস্পরকে, সেখানে মনে হয় আলো-আঁধারের কোন প্রভাব নাই। মেঘের শেষ পর্যন্ত আর সহ্যই হলনা। এবার সে গর্জে উঠলো যমদূতের মত।

দীননাথ প্রথম স্পর্শ করল মালতীকে-ভয়ে নয়, ভয় দূর করতে। মালতী স্বামীর বুকে মাথা ঠেসে ধরে ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'হামার শাড়ী লাগবেনা, ঘরোত চলো।'

৩

রাত একটার কাঁটা ধরধর। কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে তাণ্ডব। প্রথমে ছিল ঝড় একা, তারপর এল বৃষ্টি। দুয়ে মিলে চালিয়ে যাচ্ছে নৃত্য। এ নাচের কোন তাল নেই। যেমন খুশি তেমন নাচছে। দীননাথের চেয়েও বেশী মাতাল মনে হচ্ছে এদের।

এমন সময় আগমন ঘটলো অতিথির। দীননাথের নয়, তার নৌকার। কিন্তু নৌকাতো এখন একপাও নড়বেনা মালিক ছাড়া, তাই ডাক পড়লো দীননাথের। শুরু হল দরজায় ঠকঠক শব্দ, সঙ্গে প্রতিবার দীননাথ শব্দটিও। সবেমাত্র দীননাথ আর মালতীর চোখে এসেছে ঘুম। দীননাথ দরজা খুললো। পাশে মালতী দাঁড়িয়ে। ঘাটের মাঝি দীননাথ। তাই অত্র এলাকার কোন মানুষ তার অচেনা নয়।

দীননাথ দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলো। লোকটির বাড়ী পাশের গ্রামে। বড় ব্যবসায়ী। সপরিবারে থাকেন ঢাকা। নাম মহিউদ্দিন প্রামানিক। সঙ্গে আছে স্ত্রী আর দুই ছেলে-মেয়ে। ছোট ছেলে-মেয়ে। কারো বয়স দশ অতিক্রম করেনি।

'বাবু ভিতরে আসেন।" দীননাথ বলল।

"না, বসব না। তুই তাড়াতাড়ি পার কর ?"

"এই ঝড় বিষ্টির অ্যাতোত লাও পার করা খুব মশকিল! ঝড় বিষ্টি থামুক, পার ক্যরা দিমুনি। বাবু ভিতরে আসেন।"

"তুক যা বলি তাই কর ? চল্ ?

স্থবির হল দীননাথের মুখ। সে ঘরে ঢুকলো। মাজায় গামছা শক্ত করে বেঁধে নিল। মালতী হাত চেপে ধরলো স্বামীর। দীননাথ চাইলো স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর চোখে ভয়। সে বলল, "মানুষের বিপদ, পার করা উচিৎ।" বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মালতী জলভরা চোখে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে এরকম বিপদে স্বামীকে চায়না আলগা করতে। স্বামীই যে তার সব। সে ভেবে পায়না, মানুষ এরকম সময়ে কেন আসে পার হতে ? তাদের কি মানবতা বলে কিছুই নাই! স্বামীর উপরও তার রাগ হয়। সে বলে "এই রকম সুময়ে পার না করলে তুমার কুনো দুষ হবে না। তুমার জীবনেরওতো দাম আছে!"

এমনি করে গেল শীতের সময় সে পড়েছিল চরম বিপদে। কঠিন শীত। তখন ছিল মাঘ মাস। প্রচণ্ড কুয়াশা। খালি চোখে দুই হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। লাইট

ফেললেও সামান্য একটু দূরত্ব বাড়ে। তখন রাত একটা। এদের মতই এসেছিল দু'জন মানুষ। শীতের সময় দীননাথের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। শীতকালে নদীর পানি থাকে তীব্র ঠাণ্ডা। নদীর আশেপাশেও থাকে একই ঠাণ্ডা। তখন মনে হয় দীননাথের বাড়ী শীতপ্রধান কোন দেশে, এদেশে নয়। এরকম শীতে তার গায়ে থাকে না তেমন কোন গরম কাপড়। এ জন্য পুরো শীত মৌসুমে সে প্রায়ই অসুস্থ থাকে। অবশ্য এসময় সে তাড়ির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়। এটি খেলে নাকি শরীর গরম থাকে। এতে শীতকালে তার পরিবারে আরো কষ্ট নেমে আসে। খাবারের কষ্ট। অধিক নেশার আয়োজন করতে গিয়ে হয় না প্রয়োজনীয় বাজার।

অনাকাঙ্খিত, অসহনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে দীননাথ নদী পাড়ি দিয়েছিল। ফিরতি পথে শারীরিক কষ্টের চেয়ে মনোকষ্ট হয়েছিল দ্বিগুণ। তাদের কাছে দুটো টর্চ ছিল। সে একটা চেয়ে ছিল। পরদিন সকালেই সে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল বাড়ীতে। তারা লাইট তো দিলইনা, উল্টো যে মন্তব্য করেছিল তাতে দীননাথের মনোকষ্টে শীতের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিল। তাদের একজন বলেছিল, "হু.....! লাইট দিই আর তুই বিক্রি ক্যোরা তাড়ি খা!" আরেক জন মাথা ঝুঁকিয়ে হাসছিল। দীননাথ কোন উত্তর করেনি। তখন নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে তার সন্দেহ হচ্ছিল। সে আজও তা স্ত্রীর কাছে বলেনি। না বলার কারণ, স্ত্রী কষ্ট পাবে। ফেরার সময় সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। কতদিনের চেনা-জানা, কতদিনের বন্ধুত্ব অথচ তখন তার কাছে শত্রু মনে হচ্ছিল এ পথকে। তার মনে হচ্ছিল, আসমান থেকে সাদা একটি পর্দা ঝুলানো তার সামনে, তাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যতই এগোয় পর্দা শেষ হয়না, যেন আরো পুরু, আরো কঠিন হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সে নৌকার হাল ঘুরিয়ে চলেছে। কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। এক মুহূর্তে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল মনে। নৌকার পিছনে সে, অথচ সামনের অংশ অদৃশ্য। নৌকা সামনে যাচ্ছে না থেমে আছে সে বুঝতে পারছিলনা। দেরী দেখে শঙ্কিত মালতী প্রদীপ হাতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ঘাটে। সে ডাক দিল "চম্পার বাবা" বলে দু'বার। শব্দও যেন কুয়াশার ভিড়ে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। দীননাথ শুনতে পেয়ে "আসিত্তি" বলে সারা দিল। মালতীর কণ্ঠের স্পর্শে তার ভয় দূর হল। যখন সে পাড়ের দেখা পেল, স্ত্রীর হাতে আলো দেখে অবাক হল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, কত কাল ধরে সে যেন আলোর সন্ধান করছে।

স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে মনে মনে বলে, "অক দেকো। ভগবান, তুমি ছাড়া আর কে আছে অর ?"

ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধে অবশেষে জয়ী হল দীননাথ। যুদ্ধ অনেক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল। মানুষ আর প্রকৃতির যুদ্ধ। মহাশক্তিধর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ বড়ই বেমানান। তবে বুদ্ধির বিচারে মানুষ মহাশক্তিধর হওয়ায় বোধ হয় কখনো কখনো প্রকৃতিকেও হার মানতে হয়। যুদ্ধে জয় পেলেও দীননাথ ঠিক জায়গায় নৌকা ভিড়াতে পারেনি। ঝড়ের গতির দিকে অনেকখানি সরে গিয়ে নৌকা ঠেকেছে অঘাটে। নামতে মহিউদ্দিন পরিবারের একটু ঝামেলাই হবে। কিন্তু তাতে কী ? নদীর পানিতেতো আর ডুবে মরতে হয়নি। এটি ভেবেই মহিউদ্দিন সাহেব ক্ষান্ত হলেন। নৌকা থেকে সবার পা পড়লো নীচে মাটিতে, তবে তীব্র কাদাযুক্ত মাটি। সবাই সবকিছু হজম করে ফেললেও মহিউদ্দিন সাহেবের স্ত্রীর বদহজম হল। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, "কেমন করে নৌকা চালাও ? এতদিনে নৌকা চালানো শিখনি ?"

দীননাথের দেহের উপর চলছে ঝড়-বৃষ্টির নির্মম অত্যাচার। আগের আমলে নির্জন কক্ষে প্রজাদের উপর জমিদারের যে চাবুক চলতো ঠিক সেইরকম। তার শরীরে লুঙ্গী আর গামছা ছাড়া কিছুই নাই। একটা মাত্র শার্ট আর একটা মাত্র গেঞ্জির মালিক সে। এগুলো ভিজার আশঙ্কায় নয়, কোনভাবে নষ্ট হয়ে গেলে পড়বে কী ? তাই সে গরম কালের এরকম সময়ে উদাম শরীরেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। গোটা দেহ কাঁপছে তার। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক সংঘর্ষ হচ্ছে। কণ্ঠ ভার হয়ে উঠেছে। সে নম্র কণ্ঠে কোন ভাবে বলে উঠে "ঝড় তো, তাই .....

কথা শেষ না হতেই সাহেবা আরও রেগেমেগে বললেন, "আমি সাইন্সের ছাত্রী, নৌকা চালানো তুমি আমাকে শিখাচ্ছো ?"

এবার দীননাথ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছে গুরুর নিকট শিষ্যের দীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। মহিউদ্দিন সাহেব প্রথম থেকেই চুপচাপ। আর কথা না বাড়িয়ে তারা চলতে লাগলো। তবে স্ত্রী বিড়বিড় করে কী যেন বলেই চলেছেন। হয়ত হবে, দীননাথের ভস্মীভূত বাপকে আবারও চিতায় তুলছেন।

৪

জ্যৈষ্ঠে বাংলায় যেমন পাকে আম তেমনি মানুষের ঘরে উঠে ধান। দীননাথের আম না থাকলেও ধান আছে। নিজের জমি নয়। অন্যের কাছ থেকে পাওনা ধান। যারা সারাবছর তার নৌকায় পার হয়ে নিজেদের ঋণী করে তারা এ সময় ধান দিয়ে সেই ঋণ শোধ করে। সব মিলিয়ে সে ধান পায় সত্তর-আশি মনের মত। এই পরিমাণের

উপর কষতে হয় তার গোটা বছরের হিসাব-খাওয়া, কাপড় চোপড়, চিকিৎসা, তাড়ি, আরো কত কী! দূরের অচেনা লোকজন পার করে সে এক টাকা করে চায়। কেউ দেয় কেউ দেয় না। না দিলেও সে কিছুই বলতে পারেনা। এতে যা পায় তা দিয়ে তার দুই-একদিন তাড়ি খাওয়াটা হয়।

দীননাথ দুটো বস্তা নিয়ে বেরিয়েছে ধান সংগ্রহে। আজ তার মনে বড়ই আনন্দ। ঘরে ধান আসবে। সংসারে জমে আছে অনেক কষ্ট, সেগুলো কিছুটা দূর হবে। প্রথমেই সে এসেছে তাজুল ব্যাপারীর বাড়ীতে। লোকটি ধানের ব্যবসা করে। সারা বছর তার লোকজনসহ হাজার হাজার মন ধান পার হয় তার নৌকাতে। দীননাথের হিসাব মতে, দুইমনের কম দেয়া বেপারীর জন্য লজ্জাকর হবে। তবুও সে একমনের আশাবাদী কেননা গতবার এমন হিসাব থাকলেও বেপারী বিন্দুমাত্র লজ্জা না করে একমন দিয়েছিল।

বেপারী দীননাথের বস্তায় ধান ঢেলে দিয়ে বললো, "দীনো, আদমন দিনু!" সে আদমন শব্দটি এমনভাবে উচ্চারণ করলো তাতে মনে হল সে অনেক ধান দিয়েছে। একেবারে দীননাথের চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে।

দীননাথ 'আদমন' শব্দটি শোনামাত্রই হতাশ হলো। মনের রং নিমেষেই ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। মনের দেয়াল ভেদ করে সে রং জায়গা করে নিয়েছে মুখমণ্ডলেও। একদম নিরব সে। তার এই চেহারা বেপারী চিনতে পেরেছে। সে একটু বিরক্তিভরে বলে উঠলো, "তুরকেরে মাতালকেরে লিয়া এই এক সমস্যা ? কিছু মনে থাকেনা তুরকেরে ? একদিন হাটোত তুই তাড়ি খাবু, তুর ট্যাকা অ্যাছলোনা। হামার কাছে দশ ট্যাকা হাওলাত চালু, হ্যামি দিবার আজী হইনি। তারপর কলু, শুদ করবার না পারলে আপনে ধান কম দিয়েন। তুই ট্যাকা দিসনি, সেই জন্যেই ধান কম দিছি।" সঙ্গে সঙ্গে দীননাথের মন কেঁদে উঠে এই বলে, "তাই বুলা আদমন ধান কম! আদমন ধানের দাম খালি দশ ট্যাকা!" সে একবার ভাবে এই ধান ফিরিয়ে দিবে, বলবে, "আপনার ধান দ্যাওয়া ল্যাগবেনা।" আবার ভাবে, "পতিবাদ হামার জন্যে লয়। যারকেরে দয়ার উপুর হামার সংসার তারকেরে কাছে নায্যমূল্যের হিসাব চাই ক্যামুন ক্যোরা ? এ্যাকুনি ঘাট অন্য কাকো দিয়া দিলে ক্যামুন ক্যোরা বাঁচমু ?" অশ্রুজল কোনভাবে ঠেকিয়ে রেখে সে ত্যাগ করলো তাজুল বেপারীর বাড়ী।

এবার গেল সে নীলকান্ত ঘোষের বাড়ী। যাদের অবস্থা ভাল তাদের বাড়ীতেই আগে যাওয়ার মনস্থ করেছে সে। এখানেও গতবারের মত আধামন ধান সে আশা

করে। এবার ধানের ফলন বেশী হলেও তার আশার ফলন বাড়েনি। এই ঘোষের গঞ্জে একটি মনোহরীর দোকান আছে। জমিজমার পরিমাণও অনেক।

নীলকান্ত ঘোষ দীননাথের হাতে দশসের ধান দিয়ে বললো, "তুইতো হিসাবে ধানই প্যাসনা! তাও দশসের দিনু! মনে থুস।" তাজুল ব্যাপারীর ধাক্কা কোনভাবে সহ্য করতে পারলেও দীননাথ ঘোষের ধাক্কা সইতে পারলোনা। সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো। চোখে ছলছল করছে পানি। আর মনে হয় কোন বাধা মানবেনা-এবার গড়িয়ে পড়বেই।

"কীরে ব্যোসা পড়লু ক্যা ? এই আট-দশদিন আগের কতা ভুলা গেলু ? তুক হ্যামি ত্যাল বাঁকী দিবার চাইনি, তুই কলু, এবার ধান দিয়েন না আপনে, তাও ত্যাল দ্যান। হ্যামি ত্যাল দিছি। আবার দশসের ধানও দিনু!' ঘোষ একটু রাগান্বিত কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

দীননাথের স্পষ্ট মনে পড়ছে, সে আড়াই'শ গ্রাম সয়াবিন তেল নিয়েছিল তিনসের ধান কম নিবে এই শর্তে। সে একবার বলতে চায় এ সত্য কথাটি। পরক্ষণেই ভাবে, বললে মাতাল বলে গালি দিবে, অন্য কাউকেও বিশ্বাস করাতে পারবেনা সে, অন্যরাও মাতালের কথায় বিশ্বাস নাই বলে উড়িয়ে দিবে। সে ভেবে পাচ্ছেনা, মানুষ কী করে এত বেঈমান হয়। উপরন্তু মানুষ যখন তাকে অবিশ্বাস করে তার বুকটা দুঃখে চৌচির হয়ে যায়। মনে মনে বলে, "হ্যামি কী দুষ করিছি ? হ্যামি তাড়ি খাই, মাতাল হই, কিন্তু কারোতো কুনো ক্ষতি করিনা ? হ্যামি কুনো সুময় মিছা কতাও কইনা। মানুষ হামাক অবিশ্বাস করবে ক্যা ?"

দীননাথ চোখের জল মুছতে মুছতে এল মানু বেপারীর বাড়ী। ধান বিক্রি করতে। আজ আর ধান তুলবেনা সে। ধানকটা বিক্রি করে গেল ভোলানাতের বাড়ী। উদ্দেশ্য, কবুতরের একটা বাচ্চা কিনবে। মাস খানেক আগে বড় মেয়ে কবুতরের বাচ্চা খেতে চেয়েছিল। তখন সে কিনতে না পারলেও এখনও ভুলেনি। সময়ে-সময়ে নিজেকে বাবা ভাবতে লজ্জা হয় তার, ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় তেমন কিছুই দিতে পারেনা বলে।

কবুতরের বাচ্চা মালতীর হাতে দিয়ে উঠানে টুলে বসেছে দীননাথ। মন তার খুবই খারাপ। এমন সময় গর্জন করতে করতে উপস্থিত হলো হিরো। দীননাথ উঠে দাঁড়ালো। হিরো এক সেকেণ্ড দেরী না করে হারামজাদা বলে কশে এক থাপ্পড় দিল দীননাথের গালে। আর একটি মারতেই মালতী এসে ঠেকালো। "মারিত্তেন ক্যান ? কী করেছে উঁই ?" মালতী কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইলো।

"গতক্যাল অ্যাত্রে তুই নৌকার ঘাটোত ছিলুনা ক্যান ? তুই থাকপুনা, পার করবে কে ? তুর মরা বাপ ? হ্যামি বিশ মিনিট ঘাটোত দাঁড়ায়্যা ছিনু, তুর দ্যাকা নাই ? তারপর এক চ্যাংড়া পার ক্যোরা দিছে। শোরের বাচ্চা.....! বলেই সে বিদ্যুৎবেগে আর একটি চড় মারলো। এবার স্ত্রী আর ঠেকাতে পারলো না। হিরো একই রূপে, একই কণ্ঠে বলে চলেছে– "হ্যামি চেয়ারম্যানের ব্যাটা! হ্যামি লাও ঠেলা পার হমু ? হারামজাদা....! পার করবার পারবুনাতে ঘাঠের দায়িত্ব লিছূ ক্যা ? আবার যদি কোনদিন এরকম হয়, তালে বুজামু মজা!"

হিরো বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল। বড় মেয়ের চোখের জল ঝড়ছে নিঃশব্দে। দীননাথ আবারও বসে পড়েছে। এবার টুলে নয়, মাটিতে। চোখে পানির ছলছলানি। সে দ্বিতীয় চড় খাওয়ার আগে হিরোকে একটি চড় উপহার দিতে চেয়েছিল। বউ আর ছেলে-মেয়েদের সামনে এমন অপমান সে মেনে নিতে পারছিলনা। চেতনা পুরোপুরি পক্ষে ছিল, আঙুলগুলোও শক্ত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত আর জাগ্রত হলনা। সর্বদা তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া ভয়টি এসে ভর করলো দানবের মত-, "যদি ঘাট ক্যাড়া ল্যায়! তালে কি করমু ? বউ বাচ্চাক কী খিলামু ?"

মালতী এবার গলা বাড়ালো–

"এইবার হছেতো ? এইবার হছে ? যাও, তাড়ি খাও ? ঠিকই হছে! এডার দরকার অ্যাছলো! ব্যাটা-বিটির সমকে ম্যার খ্যালে, আর কী বাঁকী থাকলো ? একুনো যদি লজ্জা না হয়, হ্যামি সত্যি এবার গলাত দড়ি দিমু ?" কথা শেষ করতে করতে মালতী জোরে-জোরে কাঁদতে লাগল। দীননাথ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বউকে কাছে বসালো। হাত রাখলো তার মাথার উপর। "বউ, এই তুর মাতা থিয়া কত্তি, আর খালি একদিন তাড়ি খামু, খালি একদিন! তারপরে আর কুনোদিন খামুনা। বিশ্বাস কর দয়া ক্যোরা! তুর সাতে বেঈমানী করার ক্ষমতা হামার নাই।" বউ মাথা থেকে হাতটি নামিয়ে চেপে ধরে বলে, "হ্যামি বিশ্বাস করিছি। এ্যাকুন থ্যাকা সাঁজেব্যালা হাটোত যাবে আর খুবই তাড়াতাড়ি ফিরা আসপে; ঐ সময় পর্যন্ত হ্যামি পার করমু।"

"আচ্ছা।" দীননাথ এক নিমেষ দেরী না করে বলল।

মালতীর ঠোঁটে হাসি, বড় মেয়ের সমস্ত মুখমণ্ডলে হাসির ঝলক, দীননাথের চোখে সুখের ছোঁয়া– এ যেন বৃষ্টির মাঝে সূর্যের আলো।

৫

দেখতে দেখতে চারপাশ ভরে উঠলো পানিতে। সবখানে শুধু পানির খেলা। পানির টানে নদীর যৌবন পেয়েছে পূর্ণতা, মরা খাল-বিলের হৃদয়ে লেগেছে প্রেমের ছোঁয়া, জেলেদের জালে মাছের লম্ফঝম্ফ, নতুন পানিতে নাউ ভাসিয়ে নতুন বউয়ের বাপের বাড়ী গমন– বর্ষা এদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এলেও দীননাথের জন্য অভিশাপ। বর্ষার পানিতে ভরে উঠে এই নদী, থাকেনা পাড়ের চিহ্ন– দু'পাড় থেকে প্রায় তিনশ হাত দূরে ধাবমান সড়কদুটিই হয় এ সময় নদীর পাড়। এবারও হয়েছে তাই। প্রতিবারের মত দীননাথ এবারও বাড়ী সরিয়ে নিয়েছে উত্তরদিকের সড়কে। এ সময় তার কষ্টও বাড়ে নদী পারাপারে। নদীর আকার হয় বৃহৎ– এ সড়ক থেকে ঐ সড়ক। অনেক লম্বা। তাই বর্ষাকালকে সে সহ্য করতে পারে না।

আজ সেই দিন যেদিন দীননাথ শেষবারের মত তাড়ি খেতে চেয়েছে। সকাল থেকে ফুরফুরে মেজাজের উপর ভর করে সময় কাটছে তার। এ ফূর্তির মাঝে এক ধরণের নিরানন্দতাও সময়ে-অসময়ে উকি মারছে। আজ বিদায় জানাতে হবে এতদিনের পুরোনো, বিশ্বস্ত সঙ্গীকে– এটি ভাবতে তার কষ্ট হচ্ছে; এক ধরণের বিচ্ছেদের সুর হৃদয়ের তলভাগ থেকে বেজে উঠছে। তবুও সে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিছুতেই আর স্পর্শ করবে না তাড়ির গ্লাস আজকের পর থেকে। ওদিকে মালতি সারাদিন ধরে প্রার্থনা করছে, "ভগবান, অ্যাজক্যাই অর শ্যাষ দিন, আর খ্যাবে না। অক ক্ষমা করো; অক দেকো।'

সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই সে বেরিয়ে পড়লো হাটের উদ্দেশ্যে। আজ নাই কোন বাজারের ভার। মালতীর কাছ থেকে এ দায়িত্ব পালনেও সে মুক্তি পেয়েছে আজ।

রাত এগারটার কিছু বেশী হবে। দীননাথ সবেমাত্র বাড়ী ফিরেছে। নেশার অবাধ বিচরণে শরীরে ক্লান্তির তাণ্ডব, চোখ-জোড়ায় যেন উদিত হয়েছে সকালের লাল সূর্য। মালতী তাকে ধরে ঘরের ভেতর নিচ্ছে। ঠিক এ সময় দুইজন লোক এল। নদীর ওপার পাড়ের মানুষ।

"এই দীননাথ, পার কর ?

ডাক শুনেই দীননাথ ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে গেল। মালতী চমকে উঠলো।

'কে ? "দীননাথ জিজ্ঞাসা করে।

"হামরা.....।" বলেই লোকদুটো সামনে এল।

"হ্যাঁ বাবু, চল ? তুরকেরোক পার ক্যোরা দিয়া আসি।

মালতী তুই বিছনা ঠিক কর ?"

মালতী দীননাথের হাত চেপে ধরলো। শঙ্কিত কণ্ঠে বললো, "না, তুমি এ্যাকুন যাবেনা ? আর আপনারাইবা ক্যামন মানুষ ? দেকপ্যার পারিত্তেন উঁই নিশা করিছে, এই ভরা গাং এই অবস্থায় পার করবার পারবে ? আর এ্যাত অ্যাত্রে কেউ পার করে ? আপনাকেরেও বিবেচনা থাকা উচিৎ ?"

"অ্যাত্রে মানুষের দরকার থ্যাকপার পারেনা ? উঁই তাড়ি খাবে, এডা কার দুষ?' লোকদুটোর একজন একটু রেগেমেগেই বলল।

"বাবু তুরা এই ম্যাগীর কতা শুনিসনা, এই ম্যাগী খুবই খারাপ। অর শরীরোত দয়া-মায়া বুলা কিছু নাই। অর কতা শুনিসনা বাবু, চল।"

মালতী স্বামীকে পেছন থেকে ঝাপটে ধরে কান্নাস্নাত কণ্ঠে বলে উঠলো, "না ? এই অবস্তায় হামি কিছুতেই যাবার দিমুনা ? আপনারা হামার ঘরোত অ্যাত্রে থাকেন, হামরা ব্যারে শুতমু– আপনাকেরে পাও ধরিত্তি, এ্যাক লিয়া য্যায়েননা!"

দীননাথ ঝটকানি মারে। দেহদুটি আলগা হল বটে, কিন্তু দীননাথ পড়ে গেল মাটিতে। মালতী আবারও গিয়ে ধরলো, তুলে বসালো। সে এবার মালতীকে ধাক্কা দিল। মালতী পড়ে গেল মাটিতে, সাথে সাথে সে আবার উঠে বসলো। জলভরা চোখে একবার সে চায় স্বামীর দিকে, আর একবার লোকদুটোর দিকে।

দীননাথ উঠে দাঁড়ালো। এবার ভাষার কারুকাজ যেন শিল্পের চরম সীমায় পৌছালো-"ম্যাগী.....! ক্যালকাই তুক বাড়ীত থ্যাকা ব্যার ক্যোরা দিমু? তুই মানুষ? তুর কুনো দয়া আছে? এই লোকগুলাক পার না করলে ক্যাম ক্যোরা যাবে ? ম্যাগী তুর ভাত নাই ক্যাল থ্যাকা ? চল বাবু ? অর কতায় কিছু মনে করিসনা তুরা। চল্ বাবু, চল্ ? ওডা মূর্খ ম্যাগী। কিছু মনে করিসনা।"

দীননাথের সব শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট নয়। কিছ-কিছু থাকছে নাকের ভেতরে, আর কিছু বের হলেও কেমন যেন জড়িয়ে-পেঁচিয়ে যাচ্ছে। সে লোকদুটোকে নিয়ে নৌকায় আসলো। মালতীও পেছন-পেছন হারিকেন হাতে নৌকায় উঠলো।

"ঐ ম্যাগী! তুই লাওত উঠুছু ক্যা ? নাম এ্যাকুনো ?"

"না ? হ্যামি তোমার সাথে যামু ?"

"না ? তুক নিমুনা ? না নামলে লগা দিয়া বারি দিমু ?"

"এই তুমি নামোতো ? তুমার জন্যেই এত দেরী হত্তে। কী হবে ? কিচ্ছু হবেনা।" লোকদুটোর একজন বলল। আরেকজন তাতে সায় দিল।

স্বামীর সঙ্গে লোকদুটোও যোগ দেয়ায় মালতীর আর নৌকায় থাকা সম্ভব হল না। নামার সময় হারিকেনটা নৌকায় রেখে দিল, আর যাত্রীদ্বয়কে বললো, " ভাই অর শরীর পাকড়াত্তে, অর দিকে খেয়াল র‍্যাখেন।"

নৌকা ছেড়ে দিল দীননাথ। মালতী ঘাটেই বসে পড়লো। চোখ দিয়ে বর্ষার বৃষ্টির মতই ঝরছে পানি। পার্থক্য এটাই-বর্ষার বৃষ্টি ঝরে সরবে, আর এটি ঝরছে নীরবে। মেঘ থাকায় আকাশে আলো নাই। চারপাশটা অন্ধকার। কোথাও এতটুকু বাতাস নাই। চারপাশ কেমন যেন থমথমে। প্রকৃতির এই কালো শরীরে ভর করে পানির বিশাল হৃদয়ে নৌকা ভাসিয়ে এক বিন্দু আলোর উপর এক রাশ আস্থা রেখে পথ চলতে লাগলো দীননাথ।

দীননাথ এখন নেশার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। শরীরটা এদিক-ওদিক দুলছে। সে অনেকটা ভাবের মাথায় হাল ঘুরিয়ে চলেছে। কিন্তু স্রোতের শক্তির সঙ্গে তার শক্তি ও কৌশলের সমন্বয় না ঘটায় নৌকা ঠিক পথে এগুচ্ছেনা। দু'জনের মধ্যে একজন এগিয়ে আসলো। এ সাহায্য দীননাথের জন্যই হোক আর তাদের জীবনের জন্যই হোক, অন্তত নৌকা ঠিকঠাক পৌছাবেতো।

অবশেষে নৌকা ভিড়লো সড়কে। লোকদুটো দীননাথকে ধরে নিচে নামালো।

"বাবু তুমি এটি ব্যোসা থাকো। এই দশ মিনিট। হামার বাড়ীর কামের চ্যাংড়াক দিয়া পাটাত্তি, দুইজনে মিলা লাও পার কোরো। তুমার এ্যাকা সমস্যা হতে পারে। আর আকাশের অবস্থাও ভাল লয়। হামার চ্যাংড়া তুমার ওটিই থ্যাকপেনি অ্যাত্রে।" লোকদুটোর একজন বলল।

"না ? হামার কাকো লাগবেনা ? হ্যামি একাই পারমু।"

"বাবু, তুমার মাতা এ্যাকুন ঠিক নাই, যা কই শুনো। তাছাড়া বিপদতো বুলা-ক্যয়া আসেনা।"

"না ? তুরা যা বাবু ? হ্যামি চ্যোলা যামু। মালতী হামার জন্যে ঘাটোত ব্যোসা আছে, দেরী হলে আগ করবে।" কথা শেষ করে দীননাথ নৌকায় উঠতেই একজন ধরে ফেললো।

"বাবু, জেদ করোনা। খালি দশ মিনিটের ব্যাপার। এই সময়ের জন্যে তুমার বউ আগ করবেনা।"

"বাবু থামো, তুমার ভালোর জন্যেই হামরা কত্তি।" আরেকজন বললো।

বল প্রয়োগে হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে দীননাথ নৌকায় উঠলো।

"এই শালারা! তুরা জানিস মালতী হামাক কত ভালবাসে ? তুরকেরে বউ তুরকোরক ভালবাসে ? তুরা কী বুজবু ? শালা বদম্যাসরা! চিটার! হামাক দেরী করাত্তে ? বারবার বুলিত্তি, মালতী হামার জন্যে ব্যোসা আছে। বদম্যাস!'

এসব বলতে বলতে নৌকা ছেড়ে দিল দীননাথ। হাল ঘুরাচ্ছে আর লোক দুটোকে গালি দিয়েই যাচ্ছে।

হঠাৎ এক দমকা বাতাস কোথা থেকে যেন এসে আঘাত করলো দীননাথকে, তার নৌকাকে। নৌকা নড়েচড়ে উঠলো। সেও কোনভাবে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু এক দমকাতেই ক্ষান্ত হলনা বাতাস। চারপাশ থেকে বিভিন্ন গতি-প্রকৃতিতে আসছে বাতাস। ক্ষণে ক্ষণে বেগ বেড়েই চলেছে। সে কিছুতেই ঠাহর করতে পারছে না বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল। নৌকা এখন মাঝপথে। বাতাসের এলোমেলো আচরণে নৌকা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আর পানিরতো বিজয়। ভরা নদীর পানির যৌবনের উচ্ছলতাতো বাতাসেরই দান। নদীর স্রোত এখন পরিণত হয়েছে ঢেউয়ে– সবেগে, সশব্দে আঘাত করছে দীননাথের নৌকাকে। প্রকৃতি বোধ হয় নীরবে এতক্ষণ দীননাথের অপেক্ষায় ছিল; মনে হচ্ছে, বহুদিনের একটা হিসাব সে মিটাবে আজ। বাতাস আর বাতাস নাই, নিমেষেই ঝড়ের রূপ ধারণ করেছে। বাতাসের কোন এক ঝাপটায় নিভে গেছে আলো। ঝড়ের বেগে হারিকেন উড়ে গেছে নদীতে। অচেনা-অজানা অন্ধকার, অকস্মাৎ ঝড়ের নির্যাতন, ঢেউয়ের নিষ্ঠুর খেলা, যুদ্ধের ময়দানে শরীরে ক্লান্তির ভার-শত্রুবেষ্টিত দিশেহারা দীননাথ হালের বাঁশটুকু দু'হাতে বুকের মাঝে চেপে ধরে শক্তিধর নদীর বুকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো।

৬

দীননাথ চিতায় উঠার কয়েকদিন পর শোকাহত মালতীও যাত্রা করলো পরপারে। দীননাথের বংশধরদের আশ্রয় মিলেছে আপাতত নানার গৃহে।

মনজিলা

১

দিন চলে যায় রাতের টানে, রাত আসে দিনের টানে--দিবা-রাত্রীর এ মিলন খেলা মানুষ এড়াতে পারেনা, সেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত এ খেলায়; সমস্যা হচ্ছে, সে শুধু গুনে কতগুলো দিন-রাত পার হল তার জীবনে, কিন্তু সে খুব কমই বুঝে যে, এ খেলার মাঝেই তার জয়-পরাজয়– প্রিয়তমা, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব, সারাজীবন এটিকে লালন করতে হবে– বুঝেছ ?

"এর আগা-মাথা কিছুই বুঝিনি আমি।"

"কি বলছ ? এত সহজ সরল কথা বুঝলেনা!"

"আমার কাছে মহাজটিল মনে হচ্ছে।"

"সুন্দর মন নিয়ে ভাব, সব বুঝতে পারবে।"

"এখন আমার মন খুব সুন্দর আছে, এত স ন্দর যে তুমি কল্পনাও করতে পারবেনা!"

"ঘরের বউ যদি না বুঝে তাহলে বাইরের মানুষ বুঝবে কী করে ?"

"পৃথিবীতে কয়টি দার্শনিকের বউ তাদের তত্ত্ব বুঝে ?"

"হ্যাঁ আমাকে দার্শনিক বলে মন্দ করনি। তোমার তো বুদ্ধি আছে, খুবই বুদ্ধিমতি মেয়ে তুমি! তত্ত্ব না বুঝলে কি হবে, আমি যে দার্শনিক তাতো বুঝেছ! এই অনেক! আস সোনামনি, একটু আদর করে দিই, এটি তোমার প্রাপ্য, তোমার অধিকার।"

"আহ! ছাড়তো ? বাবাকে ঔষধ খাওয়াতে হবে।"

"এই একটু পরে যাও টুকটুকি! আমার চাঁদ! আমর মন! অমার.....!

"তোমার সবকিছু !" বলেই স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে আল্গা করে স্বামীর ঠোঁটে জোরেসোরে একটা কামড় দিয়ে ঘর থেকে দৌড়ে পালালো মনজিলা।

Okay .....! মন, ব্যাপারটি আমি দেখব। ওরে বাবারে.....! একদম কেটে গেছে মনে হয়।"

২

সকালের বৃষ্টি বড়ই মনোমুগ্ধকর মনজিলার কাছে। সে কান পেতে আপন মনে শুয়ে শুয়ে শুনে বৃষ্টির শব্দ। আজও একই রূপ। স্বামী বেচারী নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, আর সে চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে খোলামনে শুনছে বৃষ্টির শব্দ।

সকাল আটটারও একটু বেশী বাজে। অফিসে যাবার সময়। মনজিলা টেবিলে খাবার রেডি করেছে। স্বামী তাড়াতাড়ি করে প্যান্ট-শার্ট লাগিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতবেগে ঠকঠক শব্দ তুলে নেমে আসলো নিচে খাবার টেবিলে।

'পরোটা এত পুড়েছে কেন ?' পরোটার চেহারা দেখেই স্বামীর প্রশ্ন।

'আমি আজ নাস্তা বানাতে পারিনি। মাশুদা করেছে।' স্ত্রী খুব শান্ত গলায় জবাব দিল।

'কেন তোমার কী হয়েছে ? স্বামী একটু রাগের স্বরে জানতে চাইলো।

'না, কিছুই হয়নি। এমনিই .....।

স্ত্রীর কথা শেষ না হতেই স্বামী চেঁচিয়ে উঠলো, " সকালের নাস্তাটুকুও বানাতে পারনা ? কাজের মেয়ের হাতে নাস্তা খেতে হবে আমাকে ?" নাস্তা আর মুখে দিলনা সে। টেবিল ছেড়ে উঠে গেল।

"রাহাত শোন, আমার কথা শোন।" স্ত্রী হাত চেপে ধরলো স্বামীর।

"ছেড়ে দাও ? আমি নাস্তা করবো না। ?"

"একটু বসো, আমি তৈরী করে আনছি। খুব অল্প সময় লাগবে।"

"না ? আমাকে এ ব্যাপারে আর বিরক্ত করনা, Please!"

স্ত্রী হাত ছেড়ে দিল। আর কোন কথা বললোনা। নিঃশব্দে স্বামীর হাতে তুলে দিল অফিসের ব্যাগ। রাহাত রাগভরা চোখে-মুখে এসে বসলো গাড়ীতে। মনজিলাও পেছন-পেছন আসলো গাড়ী পর্যন্ত। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়ার আগ মুহূর্তে চুপি চুপি কণ্ঠে বলে উঠলো, "দুপুরে বাসায় খেও।" স্বামী সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলনা। গাড়ী চলে গেল। গাড়ী বাড়ীর সদর দরজা পার হওয়া পর্যন্ত মনজিলা চেয়ে রইলো। চোখে এসেছে জল। এক্ষুণি বুঝি গড়িয়ে পড়বে। সে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের কোণটা মুছে বাড়ীর ভেতরে এল।

"ভাবী হামার জন্যে আপনাক বকা খাওয়া লাগলো।"

"ধুর পাগলি! এটা কোন বিষয়! পরোটাতো আমিও দু-একদিন পুড়ে ফেলি। আসলে তোর ভাইজানের মনটা বোধ হয় আজ ভাল নাই। এটা কোন ব্যাপারই না। আমি সব ঠিক করে নিব। তুই আফজালকে ডাক, বাজারে যেতে হবে।"

মাশুদার মনটা ফুরফুরে হলো। এতক্ষণ ভয়ে জ্যাম লেগে ছিল। সে খুব ভাল বাসে ভাবীকে। ভাইজানের ক্ষেত্রে পুরো উল্টো। ঠিক ততটাই ভয় পায় তাকে। ভাবীর

কাছে সব কথা বলে সে অবলীলায়। বুদ্ধি-পরামর্শও নেয় প্রয়োজনে। কাজের মেয়ে হলেও তাকে মনজিলা আপন বোনের মতই দেখে।

"বৌমা.....! বৌমা.....!"

"জি....বাবা..... আসছি।" মনজিলা দ্রুত ঘরে এল।

"কিছু সমস্যা বাবা ?"

"না মা, আমার কোন সমস্যা নয়। রাহাত চেঁচামেচি করল কী কারণে ?"

"ও.....! বাবা, ঐটা কিছু না।" মনজিলা হেসে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো; যেন কিছুই হয়নি।

"আমিতো ওর উচ্চকণ্ঠ শুনলাম।"

"বাবা, ঐ... বলছিল যে, পরোটা পুড়েছে কেন। বাবা ঐটা আমার দোষ। আপনার ছেলে পোড়া পরোটা দেখতেই পারেনা। আমারই সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল।" বাবাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো সে।

"কেন ? পরোটা কী পুড়তে পারেনা দু-একদিন ? আমিওতো খেলাম, কৈ কোন সমস্যাতো হলনা ?"

"বাবা আমি এসব ভাবছি না। সে নাস্তা না করে বেরিয়ে গেল– খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। আপনি এ ব্যাপারে ওকে কিছুই বলতে পারবেন না কিন্তু, হ্যাঁ..।" মনজিলা বাবার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো। তবে এ কান্নার মাঝে আহ্লাদের কমতি নেই।

"না মা, না। তুমি ওকে একটু বেশীই লাই দিচ্ছ, পরে তুমিই বিপদে পড়বে। দেখো মা, আমার কাছে তোমার আর ওর মাঝে কোন পার্থক্য নেই, দু'জনেরই সমান অধিকার। সে যেমন আমার ছেলে, তুমিও তেমনি আমার মেয়ে। তাই বলে দিচ্ছি, এরপর ওর এ ধরনের কোন অত্যাচার আমি সহ্য করবোনা ?"

"ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। আপনি এবার নিশ্চিন্তে শুয়ে বই পড়ুন। গোসলের সময় হলে আমি আসব। বাবা রবী ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়া হয়ে গেছে ?"

"ও, হ্যাঁ, তোমাকেতো বলাই হয়নি। গতকালই শেষ করেছি ওটা।"

"কী রহস্যময় অথচ পরিচ্ছন্ন গল্প, না বাবা ?"

"হ্যাঁ....। অপূর্ব সৃষ্টি। আর কারো পক্ষে এরকম সৃষ্টি সম্ভব কিনা বলা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ না আসলে বাংলা সাহিত্য অন্ধকারে থেকে যেত। আচ্ছা মা, আমার ঐ ছাগলটা মানে রাহাত কি বই-টই পড়ে ?"

মনজিলা আঙুল উচিয়ে ভারী কণ্ঠে জোরে বলে উঠলো, "আমি প্রথমে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাচ্ছি– আমার স্বামীকে এরপর থেকে আর ছাগল বলা যাবেনা। এবার আঙুল নামিয়ে হাসিসিক্ত ঠোঁটে আবারও বাবার কাঁধে মাথা ঠেস দিয়ে অতি নম্রভাবে বললো, ওর কি সময় আছে বই পড়ার। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে। একদম ক্লান্ত হয়ে যায় বাবা। কীভাবে তখন বই পড়বে, বলুন।"

"ঠিক আছে, ওকে আর ছাগল বলবোনা। কিন্তু খেয়াল রেখ, আমাকে অন্য কোন শব্দ যেন ব্যবহার করতে না হয় ?"

মনজিলা চট করে মাথা তুলে দুই হাত বাবার দুই কাঁধে রেখে হাসিভরা মুখে বললো, "Thank you, বাবা।"

"কিন্তু আমিও তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ঐ কথার– সারাদিন পরিশ্রম করেও বই পড়া যায়। আমি পড়েছি, অসুস্থ থাকার পরও এখনো পড়ছি, মৃত্যু পর্যন্ত চলতেই থাকবে। যে পড়বে সে এমনিই পড়বে। অজুহাত দেখিয়ে বই পড়া হয়না।"

সে বাবার উদ্ধত আঙুলটি দুই হাতে ধরে হাসি মুখে বিনয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, "বাবা, এখন থেকে ওকে বই পড়ানোর চেষ্টা করব, যাকে বলে চরম চেষ্টা। আমি আশা করছি, সফল হব। তাছাড়া ও আমাকে বলেছে, ভার্সিটি জীবনে সে অনেক বই পড়েছে। আমার কী মনে হয় জানেন বাবা, ও হচ্ছে এখন একটা নিস্প্রভ প্রদীপ, শুধু আগুনের ছোঁয়া পেলেই ধপ করে জ্বলে উঠবে– আপনি কী বলেন, বাবা ?"

"আমি তোমার হাসির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিনা বলে দুঃখিত। তবে চাই তাই যেন হয়।"

"হ্যাঁ, বাবা, হবে --- হবে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত। এখন আপনি শুয়ে পড়ুনতো।"

বাবাকে শুইয়ে দিয়ে মনজিলা ঘরের বাইরে এল। কিন্তু এক নিমেষ দেরী না করে আবারও ঢুকলো ভেতরে।

"বাবা এখন এক কাপ চা হলে কেমন হয় ?" ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

"ওহ্! Nice! এই জন্যইতো তুমি আমার মা, ছেলের কখন কী প্রয়োজন বুঝতে পার।"

"আসছি।" সে হাতের আঙুলগুলো উঁচিয়ে বাবাকে আশ্বস্ত করে সোজা চলে গেল রান্না ঘরে।

ক'দিন হল বাবা-মার জন্য মন পুড়ছে মনজিলার। প্রায় মাসতিনেক হল সে দেখেনি বাবা-মাকে। আর একটা মাত্র ভাই, তাও আবার ছোট। সেতো তার জানের জান। রাহাতকে সে বলেছে বাবা-মাকে দেখতে যাওয়ার কথা। সে কয়েকদিন ধৈর্য ধরতে বলেছে। সে নিজেই তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ক'দিন তার আর সহ্য হচ্ছে না। পারেতো এখনই যায়। ওদিকে বাবা মা'কে, ভাইকে ফোন করেছে আসার জন্য। কিন্তু তাঁরা নিরূপায়। বাবার স্কুলে চাকরি। স্কুল এখন পুরোদমে চলছে। মা'কে সংসারের কাজ-কর্ম দেখাশুনা করতে হয়। তাছাড়া উনি একা আসবেনইবা কী করে ? ভাইয়ের সামনে পরীক্ষা। তারতো আসার প্রশ্নই আসেনা। তাই উল্টো তাঁরাই তাকে যেতে বলেছেন। জামাইকেও বলেছেন। অনুমতির কাজটাও সেরে ফেলেছেন বেয়াই সাহেবকে বলে।

বাবাকে সে পায়েস বানিয়ে খাওয়াবে। একেবারে দুধের পায়েস যাকে বলে। চাল ও চিনি রেডি। বাবা এ বাড়ীতে ঢুকলেই কেনা হবে দুধ, তৈরী হবে সুস্বাদু পায়েস--- বাবাকে সে নিজ হাতে খাইয়ে দিবে। মনে পড়ে, ছোট বেলায় একবার সে বাবার জন্য রাখা পায়েস খেয়ে ফেলেছিল গোপনে, আর সেজন্য বাবা তাকে একটা চড় দিয়েছিলেন। ঘটনাটি মনে পড়তেই তার চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। "বাবা তুমি কবে আসবে ? তোমার পছন্দের পায়েস আমি তৈরী করব নিজ হাতে, খাইয়ে দিব তোমাকে– তোমার যত ইচ্ছে খাবে, প্রাণ ভরে খাবে। আস বাবা, তাড়াতাড়ি আস।" চোখ মুছে কাপে চা ঢেলে গেল বাবার ঘরের দিকে।

৩

দুপুরের খাবার তৈরী। টেবিলেও সাজানো হয়েছে সুন্দরভাবে। খুব চমৎকার এক পরিবেশ। একজন রুচিহীন মানুষের পক্ষেও বোধ হয় গপগপ করে খেয়ে ফেলা সম্ভব। এরই মধ্যে ফিরেছে রাহাত। সে কোন কথা না বলে সোজা উঠে গেল উপরের ঘরে।

"মন.....! মন.....! মন.....!"

কোন সারাশব্দ মিললনা। কিছুক্ষণ পর আবার ডাকতে শুরু করলো।

"মন.....! মন.....! মন.....!"

"কী হলো, ষাঁড়ের মত চিৎকার করছ কেন ?"

রাহাত জড়িয়ে ধরলো মনজিলাকে।

"মন, তোমার এত বুদ্ধি কেন বলতো সোনা ? কী করে বুঝলে যে আমি ষাঁড়ের মত ক্ষেপেছি ?"

"আহ্, ছাড়না! আমার গায়ে ঘাম।"

"তোমার গায়ে ঘাম, আমার গায়েও ঘাম-সমানে সমান।

"ছিঃ! ছিঃ! খাবার সময় হয়েছে। বাবা খেতে বসবেন। তোমার লজ্জা সরম বলে কি কিছুই নাই।"

"না, নেই! আমি লজ্জাহীন এক প্রাণী।"

"দেখো খুবই একটা বাজে কাণ্ড ঘটে যাবে কিন্তু।"

"না, কিছুই ঘটবে না।"

"ছিঃ! সরো ?"

স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে মনজিলা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

"ও! শিট! নিজের বউ, তারপরও এ অবস্থা! ধুৎ! খেতেই যাবনা ? তোমরা খাও যত ইচ্ছা!"

রাহাত ধাম করে শুয়ে পড়লো বেডে। চোখ-মুখ কিছুটা বিক্ষিপ্ত।

"রাহাত.....! রাহাত.....!"

"ওহ! NO.....! বাবার অত্যাচারেও দেখছি বাঁচা দায়! আসছি বাবা।"

"বৌমা তুমিও বসো।"

"না বাবা, আপনারা খেয়ে নিন, আমি পড়ে খাব।"

"পরে কেন ? একসঙ্গে খাব। বসো..... বসো।"

"আচ্ছা বাবা, বসছি।" রাহাত এল।

"কীরে, খাবার সময় এত ডাকাডাকি করতে হয় কেন ?"

"না বাবা, কিছুনা। ফ্রেশ হলাম। আর একটু ক্লান্তও লাগছে।"

রাহাতের কথায় মনজিলা ঠোঁট চেপে হাসছে। রাহাত সেটি লক্ষ্য করে বড়বড় চোখে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিল।

"তোমাকে কী দেব বলো ? মাছ না মাংস ? মনজিলা বললো রাহাতকে।

"আমি নিয়ে খাচ্ছি, তুমি বসো।"

স্বামীর রাগ দেখে মনজিলার খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু শ্বশুর মশাইয়ের সামনে তা ইচ্ছামত প্রকাশ করতে পারছে না।

"বাবা, আপনাকে আর কী দিব ?"

"মা, তুমি বসোতো, আমরা নিয়েই খেতে পারব।"

মনজিলা-রাহাত এখন মুখোমুখি বসা। মনজিলার ঠোঁটে হাসি। রাহাতের ঠোঁট রাগে ফোলা। মনজিলা টেবিলের নিচ দিয়ে রাহাতের পায়ে পা দিয়ে ঘষা দিচ্ছে। এতে তার রাগ আরো বেড়েই চলেছে। সে মনজিলার দিকে এখন আর তাকাচ্ছেনা। মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। এখন রাহাতকে খুব বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছে মনজিলার। কিন্তু রাহাত কোন প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় তার কৌতুহল বাড়ছে।

"বাবা, রাহাত হাড়যুক্ত মাংস খুব পছন্দ করে, আমার প্লেট থেকে এই টুকরাটি ওকে দিই.....!

মনজিলা চোখে-মুখে একরাশ ভালবাসা আর লজ্জা নিয়ে বাবার কাছে আবেদন জানালো। এটি শোনামাত্রই রাহাতের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, দাও---- দাও। হাড় চিবালে দাঁত শক্ত হয়। ও তো আগে হাড়যুক্ত মাংস খেতইনা। তুমি আসার পর পরিবর্তন দেখছি। আমার খুব ভাল লাগছে।" বৌমাও হেসে শ্বশুরের কথায় সায় দিল।

"বৌমা, তোমারও হাড় চিবানো উচিৎ।"

"এই যে বাবা, আমার পাতে দুটো।" মনজিলা হেসে প্লেট একটু উঁচু করে দেখালো।

বাবা হেসে আঙুল নাড়িয়ে বললেন, "বৌমা তুমি আমারই মত।"

বৌমাও শ্বশুরের হাসিতে তাল মিলিয়ে বললো, "জি বাবা।"

এবার মনজিলা তার প্লেট থেকে হাড়টি রাহাতের প্লেটে দিয়ে এক ঝলক সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হাসি দিয়ে বললো, "বড়টিই দিলাম, দাঁত শক্ত হবে।"

রাহাতও এক নিমেষ দেরী না করে মনজিলার ডানপায়ের পাতায় বাঁ পায়ের বুড়া অঙুল দিয়ে জোরে দিল এক গুঁতা। তাতে আঘাত পেলেও মনজিলা নিঃশব্দে হেসে উঠলো।। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে শব্দ করে উঠলো, 'আহ্!'

"কী হলো বৌমা ? কী হল ?"

রাহাতও চাইলো, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের করলোনা।

"দাঁতের মাড়িতে বোধহয় হাড়ের টুকরা বিঁধেছে।"

"দাঁড়াও ..... দাঁড়াও ..... ! সাবধানে বের করতে হবে। এই তুই বসে বসে কী দেখছিস ? তাড়াতাড়ি বের কর ?"

রাহাতকে ধমক দেয়াতে খুব মজা লেগেছে মনজিলার। ঠোঁট চেপে হাসছে। কিন্তু বাবার চোখ পড়তেই গালে হাত দিয়ে আবারও শব্দ করল, "উহ্ .....!"

রাহাত কাছে আসল। মনজিলা চেয়ারটা ঘুরিয়ে রাহাতের মুখোমুখি হল। বাবা পেছনে বসে কিছুটা অস্থির দৃষ্টিতে দেখছেন।

"হা কর ?" মনজিলা হাসছে।

"কী হল, হা কর ?"

এবার মনজিলা হা করল। কিন্তু হাসি বন্ধ হচ্ছে না। শব্দহীন হাসি। রাহাত বুঝতে পেরেছে, কিছুই হয়নি। মনজিলা ইচ্ছে করেই এমনটি করছে। তাই সে যেমন-তেমন দেখেই বলল, 'কৈ, কিছুইতো নাই।"

"কিছু না থাকলে ও এমনিই অমন করছে ? ভাল করে দেখ ?" বাবা আবারও ধমক লাগালেন।

রাহাত রাগে ফুঁসছে। আবার দেখার জন্য চোখ মেলতেই মনজিলা ঠোঁটে এক চিলতে হাসি টেনে স্বামীকে চোখ মারলো। রাহাত এবার ভাল করে দেখে ফিরে গেল নিজ জায়গায়।

"কী, কিছুই পাওয়া গেলনা ?"

"না বাবা।" রাহাত একটু ভারী গলায় উত্তর দিল।

"তাহলে বাবা, এমনটি হল কেন ?" বৌমার আহ্লাদ আর ভয় মিশ্রিত প্রশ্ন।

"মা, আমার মনে হয়, দাঁতের গোড়ায় ব্যথা করছে। এটা অনেক সময় এমনিতেই হয়। আবার দাঁতের সমস্যাও হতে পারে। রাহাত আজকেই বৌমাকে ডাক্তার দেখাবি ? প্রয়োজনে বিকালে ফ্যাক্টরিতে যাবিনা। আর কী হল, আমাকে জানাবি ?"

"জি বাবা।"

মনজিলা স্বামীর দিকে চেয়ে খুবই সূক্ষ্ম এক ঠোঁট কাঁপানো হাসি দিয়ে আবারও খেতে অরম্ভ করল। বাকী দু'জনও খাওয়া শুরু করলো।

রাহাত রাগে ফুঁসফুঁস করছে। একটু বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল তাও হলনা। মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় শুতে ইচ্ছে করছে না। বারান্দার রেলিং-এ ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে। ওদিকে বিকালে সমস্ত প্রোগ্রাম তার মাটি হওয়ার পথে। বিকালে সে তার বান্ধবিকে নিয়ে বেরুবে। ভার্সিটি জীবনের বন্ধু। প্রোগ্রাম সেট করেছে আশুলিয়াতে। একেবারে পাকা কথা দিয়েছে সে। এখন দেখছে সব ধূলিসাৎ হওয়ার

পথে। অন্যদিকে একটা অপমান, একটা লজ্জার জ্বালাও তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। তার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ঘন-ঘন সিগারেট টানছে। গা দিয়ে দু'এক ফোঁটা ঘামও ঝড়ছে। এখন সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বাবার আদেশ। কী করে সে তা অমান্য করবে। বাবার মুখের উপর না বলার সাহস নাই তার। অন্যদিকে মনজিলাকেও সে এ মুহূর্তে শত্রু ভাবছে। তাকেতো সে বলতেই পারবেনা বান্ধবীদের কথা।

মনজিলা বাবাকে ঔষধ খাইয়ে দিয়ে ঘরে এল। স্বামীকে গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখে তার হাসি পেল। সে হাসতে হাসতে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো স্বামীর পেছনে। তারপর স্বামীর মাথার ওপর দিয়ে নিজের মাথা ও ঘার বাঁকা করে স্বামীর মুখোমুখি হলো। এ অবস্থায় দু'জনার নাক-মুখ-চোখের দূরত্ব খুব যৎ-সামান্য, তা মাপার সাধ্য আর কারো বোধ হয় হবেনা। স্বামীর চোখে চোখ রেখে সে ফিক করে হেসে উঠলো।

"সরো এখান থেকে, বিরক্ত করোনা ?" স্বামীর কণ্ঠে রাগের ছোঁয়া।

"না, সরবনা ? আমি এখানে এভাবেই থাকব ?"

"আ.... হ্.....! সরতো ?" রাহাত স্ত্রীকে ঠেলে সরিয়ে দিল। কিন্তু না! মনজিলা আবার এসে পেছনে থেকে স্বামীর মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরলো।

"দেখো মনজিলা, মেজাজটা খারাপ করাওনা ? যাও এখান থেকে ? আমাকে একা থাকতে দাও ?"

"NO ? আমার যে একা থাকতে ভাল লাগছে না–আমি এখন তোমাকে চাই। উঠো সোনামনি! আমি দেখছি কী হয়েছে তোমার। তোমার রাগটা কোথায়, এবার দেখছি আমি। উঠো জান! জান আমার!"

স্ত্রীর টানাটানিতে রাহাত কোন বাধা দিচ্ছেনা, শুধু কিছুটা শক্ত হয়ে বসে আছে। "উঠোতো.....! হিঁ.....! হিঁ.....! আমি তোমাকে টেনে তুলতে পারব তাই, তুমি না উঠলে ?" সোহাগ আর কান্নাভাব মিশ্রিত এই শব্দগুলো বোধ হয় স্বামী আর অবহেলা করতে পারল না। সে উঠে দাঁড়ালো। তবুও চোখে-মুখে রাগের ছোঁয়া বিদ্যমান।

"এইতো আমার লক্ষ্মীসোনা! জাদু! চলো..... চলো..... টুকুটুকু!" দু'জনেই এল বিছানায়। স্ত্রীর আদর-সোহাগেও স্বামী মুখ খুলছে না, গোমড়া-মুখে চুপচাপ আছে।

"এই.....! আমার দিকে তাকাও। আমি দুঃখিত। আমার ভুল হয়ে গেছে। তাকাওনা বাবা!" তবুও মুখ ফেরায় না স্বামী।

"যাও ছেলে! ছিঃ! ছিঃ! পুরুষ মানুষরা কখনো এত রাগ করে! রাগ মেয়েদের মানায়।" রাহাত তড়াক করে স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো, "তখন বললাম, একটু শোন---না ? বাবা টেবিলে খেতে আসবেন! কেন, বাবা অসুস্থ মানুষ, তাঁকে বেলা একটার মধ্যে খাবার দেয়া যায়না ?"

মনজিলা হাসছে।

"একটার মধ্যে রান্নাতো শেষ হয়না।"

"কেন হবেনা ? কী এমন কাজ থাকে তোমাদের যে একটার মধ্যে রান্না শেষ করতে পারনা ? খালি বসে বসে খাওয়া সব !"

এবার মনজিলা হাসতে হাসতে বলে,

"ঠিক আছে, এখন থেকে একটার মধ্যেই রান্না শেষ হবে। আচ্ছা তুমি কী বলতো! আমি কি হারিয়ে যাচ্ছি ? আমৃত্যু তোমার কাছে আছি।"

"দাঁতে হাড় ফোটার অভিনয় করলে কেন ?"

স্বামীর মুখে নাই কোন হাসি। সর্বদায় একটা রাগ-রাগ ভাব নিয়ে কথা বলছে, আর কথার মাঝে একটা আধিপত্যের অস্তিত্ব।

"একটু মজা করলাম।" স্ত্রীর সোজা-সাপ্টা ঝটপট উত্তর। আর মুখে হাসিতো আছেই।

"জান, তুমি আমার কত বড় সর্বনাশ করেছ ?"

"সর্বনাশ করেছি! আমিতো অন্যকিছু ভেবে এটা করিনি।" এবার মনজিলা একটু বিস্মিত হলো।

"বিকালে অফিসে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, এখন তোমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেলে কাজ করবে কে ? টেরতো পাওনা, কীভাবে টাকা আসে ?"

নিমেষেই স্ত্রীর বিস্ময় দূর হল। হাস্যাজ্জ্বল ঠোঁটে স্বামীর ঠোঁট স্পর্শ করে বললো, "এটা কোন ঘটনা হলো! এর জন্য মানুষ কখনও মন খারাপ করে থাকে ? পাগল ছেলে।"

"ঘটনা নয় মানে ? কী উল্টা-পাল্টা বকছো ?" রাহাত কিছুটা তেড়ে উঠলো। মনজিলা স্বামীর তেড়ে উঠা দেখে জোরে হাসতে লাগলো। রাহাত বড় বড় চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। হাসি থামিয়ে স্বামীর গালে আলতোভাবে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে বললো, "অবশ্যই অফিসে যাবে। একশ'বার যাবে।"

"অফিসে যাব মানে ? বাবার কথা মনে নাই ?"

"হ্যাঁ, আছে। বাবাকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার। ও নিয়ে তোমাকে আর এক বিন্দুও ভাবতে হবেনা সোনা।"

"হ্যাঁ, তোমার ম্যানেজতো আমি চিনি ? সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে ম্যানেজ করবে বাবাকে-ও আমি বুঝি !"

"স্বামীধন, আপনিতো প্রতিদিন বহুকিছু ম্যানেজ করেন, এবার আমার ম্যানেজটা একটু দেখেননা।"

"দেখো, তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে কাজটা করা যাবে, কিন্তু খুব ঝামেলা হবে, তারপরও কী আর করার! তাই বলছি ভাল করে ভেবে দেখো, পারবে কি-না ?"

"আরে ব্যাপারইনা ! এ বিষয়টা এখন পুরোপুরি মাথা থেকে ঝেরে ফেলো। আমি আছি তোমার পাশে। কী, এবার হাসবেনা ?"

রাহাত কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মাথাটা স্ত্রীর বুকে আড়াল করে শান্ত গলায় বলে উঠে, "আমাকে ক্ষমা করো, অনেক উল্টা-পাল্টা কথা বলেছি তোমাকে।"

মনজিলা স্বামীর মাথা শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর মাথার উপর গাল ঠেকিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বললো, "কিছু মনে করলেতো ক্ষমা পাবে!"

"আমি তোমাকে ভালবাসি.....! আমার জীবনের চেয়েও বেশী.....! আমার জান.....! এসব বলতে বলতে মনজিলাকে পেঁচিয়ে ধরলো রাহাত।

"এই দেখো.....! দেখো.....! তুমি অফিসে যাবেনা ? শয়তান....! স্ত্রী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। মুখটা চেপে ধরলো রাহাত।

গাড়ীতে চেপেছে তিনজন। লক্ষ্যস্থল আশুলিয়া। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যখন স্থির তখন ভাবনার অবকাশ কোথায়। আর তাই বুঝি এই তিনজনের ভাবনাহীন মনের রস চুয়ে-চুয়ে পড়ছে সর্বত্র। খুবই উৎফুল্ল এরা। রাহাত ড্রাইভ করছে। পেছনে হাসি-খুশী দুই বান্ধবী। এটি রাহাতের একদম ব্যক্তিগত গাড়ী। যাকে তার ভাল লাগে শুধু তাকেই এ গাড়ীতে উঠায়। এই ভাল লাগা-নালাগার তালিকায় মনজিলাকেও সময়ে সময়ে অনুপস্থিত থাকতে হয়। এক ধরনের বিলাসী গাড়ী। রাহাত আজ অনেক দিন পর এরকম ড্রাইভে বের হয়েছে। বহু প্ল্যানই হয়, কিন্তু কাজের ভিড়ে সময় বন্ধু হয়ে উঠেনা। তাই আজ প্ল্যানটি সাফল্যের মুখ দেখছে। অবশ্য এজন্য সে মনে মনে অসংখ্যবার মনজিলাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই দুই বান্ধবী তার খুবই ঘনিষ্ট। একে অপরের আত্মার মধ্যেই এদের বসবাস।

মনজিলা পরপর দুইবার রিং করেছে রাহাতকে, কিন্তু সে রিসিভ করছেনা। মনজিলার ভয়ও করছে, না জানি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছে রাহাত। কিন্তু তার কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ, তাই মন মানছে না। আবারও কল করল সে। হ্যাঁ, এবার রিসিভড্ হলো মোবাইল।

"শোন, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আছো কি ?"

"কেন ?" এ সময় স্ত্রীর ফোন আসাতে কিছুটা বিরক্তই হয়েছে রাহাত।

"একটু কথা বলবো। তুমি বের হওয়ার সময় বলতে চেয়েছিলাম, মনে ছিলনা।"

"ঠিক আছে বলো।"

"চাচী ফোন করেছিলেন। কী একটা কাজে বাসায় যেতে বললেন--- যাব ?"

"আচ্ছা, যাও। শোন, বাবাকে জানিয়ে যাও।"

"অবশ্যই.....! অবশ্যই.....!

হালকা ভাবনার উদয় হল মনজিলার মনে। ভাবছে, "অফিসে কাজ বলে গেল, কিন্তু মনে হল গাড়ীর ভেতরে, আবার মেয়ের কণ্ঠও শুনলাম।" পরক্ষণেই ভাবছে, "অফিসের কর্মকর্তারা হতে পারে, হয়ত অন্য কোথাও যাচ্ছে অফিসের কাজেই।" সে আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়না। সোজা চলে এল বাবার রুমে।

"ওহ্ ! বাবা....! মাথার চুলগুলো দেখেছেন একবার কী অবস্থা ?"

বাবার সামনে দাঁড়িয়ে একটু আদেশসূচক কণ্ঠে বললো মনজিলা। এও ধ্রুব সত্য যে, সেই কণ্ঠে মিষ্টতার বিচরণ ছিল অবাধ।

বাবা একটু ইতস্তত হয়ে মাথার চুলে হাত দিয়ে হেসে ফেললেন।

"মা, রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে এ ধরনের কাজের কথা আর খেয়াল থাকছেনা। খুব মজা পাচ্ছি মা, খুব মজা!"

মনজিলা চিরুনী দিয়ে সুন্দর করে বাবার চুল আঁচড়াতে লাগলো।

"বাবা, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি আবৃত্তি করে অমাকে শোনাতে হবে ?"

"অবশ্যই হবে ?"

"কবে বাবা ?"

"আমি দুইদিন প্র্যাকটিস করে নিই, তারপর একদিন একটু ভারী রাতে ছাদে বসে আবৃত্তি হবে।"

"তাহলে সেটা হবে পূর্ণিমা রাতে।"

"পূর্ণিমা রাত !"

"হ্যাঁ, বাবা!"

"হা..... হা.....হা.....! কী যে মজা হবে মা! অন্যরকম একটা রাত হবে।"

"বাবা আমার আনন্দে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছে।"

"চিৎকার দিবে, দাও।"

"না বাবা, আজ নয়, ঐদিন চিৎকার দিব। বাবা, ঐদিন গোল করে চারপাশ ফুলের টব দিয়ে ঘেরা হবে, মধ্যে থাকবে খেজুর পাতার পাটি, পাটির একপাশে বসে আপনি কবিতা আবৃত্তি করবেন, অপর পাশে বসব আমি আর রাহাত, পাটির মাঝখানে থাকবে কাঁসার গোল পাত্র আর তাতে সাজানো থাকবে সুগন্ধি পান, আবৃত্তি শেষ হলে আমরা সবাই পান খাব---- বাবা, প্ল্যানটা কেমন হল ?"

"চমৎকার ! চমৎকার ! পান থাকবে ..... পান ! বাঃ ! কঠিন ! কঠিন! খুবই nice একটা আইডিয়া মা। তাহলে মা, প্রোগ্রাম সেট হয়ে গেল। মা শোন, বেয়াই সাহেব ফোন করেছিলেন। তোমরা একবার যাওতো, যাও, ঘুরে আস। বাব-মা-ভাইকে দেখে আস।"

মনজিলা পেছন থেকে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "এইতো আমার বাবা।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই, আমিই তোমার বাবা। তবে জানকি মা, তোমার কাছে ভালবাসা আর গুরুত্বের ক্ষেত্রে আমরা দু'জন সমান হলেও তোমার ওপর অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁর পাল্লাটা একটু হলেও ভারী– এটাই সত্য, এটাই স্বাভাবিক।"

"তাহলে কবে যাব, বাবা ?"

"কালকেই যাও।"

"কালকেই!"

"হ্যাঁ.....!"

"না বাবা। রাহাতের কাজটাজ থাকতে পারে। তুমি বরং ওর সঙ্গে আলাপ করে একটা ডেট ফিক্সড্ করে দিও।"

"ওর সঙ্গে আবার কিসের আলাপ ? আমি যে ডেটে বলব সেই ডেটেই যাবে।"

"আচ্ছা বাবা। বাবা, চাচী ফোন করেছিলেন তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য। রাহাতকে বলেছি, আপনি অনুমতি দিলে একবার যাব ভাবছি।"

"কিসের অনুমতি ? অবশ্যই যাবে– যাও...যাও।"

"তাহলে আমি যাচ্ছি বাবা। সন্ধ্যার পরপরই চলে আসব।"

"হ্যাঁ, যাও।"

মনজিলা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

৪

কিছু আগে ফিরেছে রাহাত। রাতের খাবার খেয়ে এসেছে। ফ্রেস হয়েই বসে গেছে অফিসের কাজে। বারান্দায় টেবিল-চেয়ারে বসেছে। মনজিলা দু'কাপ কফি হাতে ঘরে ঢুকলো।

একটা স্বামীকে দিল। নিজেরটায় চুমুক দিতে দিতে একটা চেয়ার টেনে বসলো স্বামীর গা ঘেঁষে।

রাহাত কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলে, "চাচীকে কেমন দেখলে ?" তার দৃষ্টি আছে কাজের মাঝে।

"ভাল। শরীর, মন দুটোই ভাল।"

"খাওয়া-দাওয়া ?"

"ব্যাপক! মাশরুর ভাইয়া আসাতে আয়োজনের পরিমাণটা একটু বেশীই ছিল।"

"মাশরুর... ! মানে তোমার চাচাতো ভাই।" কিছুটা গম্ভীর গলায় বলল সে।

"হ্যাঁ..... ! কী চেননা বোধ হয় ?" আঙুল দিয়ে স্বামীর বাহুতে আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল।

"অন্য কারো নাম মাশরুর হতে পারেনা ? তো খুব মজা করলে নাকি ?"

"মজা বলতে আর কী ? মাশরুর ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করলাম।"

"তোমার চাচী গল্প করেনি ?" রাহাতের কথা স্বাভাবিক হলেও ভেতরটা রাগে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। মনজিলা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে।

"হ্যাঁ করেছে, তবে বেশিক্ষণ না।"

"তাহলে তোমার চাচী মাশরুরের সঙ্গে গল্প করার জন্য তোমাকে ডেকে নিয়েছিল নাকি ?"

"কী বল!" চোখ একটু বড় করে ঠোঁটে এক ঝলক হাসি টেনে বলল।

"তা নয়তো কী ? বললে, চাচী যেতে বলেছে, আর গল্প করে আসলে মাশরুরের সঙ্গে!" কিছুটা রাগ-রাগ কণ্ঠে বলল। এবার কলম রেখে দিল সে। মাথা নিচু করে রাগে ফুঁসছে।

"এই ! ভুলে যাচ্ছ কেন মাশরুর ভাইয়া আমার বড়।" হাসিসিক্ত ঠোঁটে স্বামীর বাহুতে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলল।

"ও ! তাকে ভাইয়া বলে মাথায় তুলে রাখতে হবে, না ?" রাহাত ক্ষিপ্ত হয়ে বলল। শেষ করে দৃষ্টি ঘুরালো অন্যদিকে। মনজিলা কিছুই পরিস্কার বুঝে উঠতে পারছেনা। সে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে স্বামীর বাহু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, " এই! কী হয়েছে তোমার ?"

"কী হয়েছে ? নাটক করছ, না ? নাটক ? সরো ?– ধাক্কা দিয়ে মনজিলাকে তার বাহু থেকে আলাদা করার চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হল না। আবারও দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরালো।

"না, সরব না ? কী হয়েছে বলতে হবে ?" ধীর কণ্ঠে জানার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বলল।

"আরে সরো ?" বলতে বলতে সজোরে ধাক্কা দিল স্ত্রীকে, মনজিলার হাত খুলে গেল। রাহাত উঠে দাঁড়ালো। মনজিলা বসেই অবাক হয়ে চেয়ে আছে রাহাতের দিকে। রাহাত মনজিলার দিকে কিছুটা ঝুঁকে বলল, "বিয়ের আগে রসগল্প করেছো, এখন না করলে ভাল লাগেনা, না ?" বলে কড়া চোখে দু-তিন সেকেণ্ড ওর দিকে চেয়ে থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরালো। রাগে শরীর একটু কাঁপছে। এবার মনজিলার কাছে বিষয়টি পরিস্কার হলো। সে বেশ কষ্ট পেয়েছে। চেয়ার থেকে উঠে এসে স্বামীকে সামনে থেকে জড়িয়ে ধরে স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলে বলল, " কী হয়েছে, শুনো একবার।"

সে স্ত্রীর দু'ই বাহু ধরে তার শরীর থেকে সরিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, " সরে যাও ? আমাকে ছুঁবেনা ?" মনজিলা আবার এসে স্বামীর হাত ধরে বলল, "তুমি শুনবেনা, আমি কেন গিয়েছি ?"

"কী শুনবো ? সরো ?'– আবারও ধাক্কা দিয়ে টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে ইজি চেয়ারে বসলো। মনজিলা নির্বাক চোখে সব চেয়ে চেয়ে দেখল। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নীরবে। সে বিছানায় গিয়ে উপর হয়ে শুয়ে পড়লো। রাহাত প্রকৃতির পানে চেয়ে সিগারেট টেনে চলেছে।

বেশকিছু সময় পার হল। রাহাত ঘরে এসে টিভি ছাড়লো। চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটি চ্যানেলে এসে স্থির হল। ইংলিশ ছবি চলছে। কিছু সময় দেখার পর বন্ধ করল টিভি। ভাল লাগছে না আর। বিছানায় এল। স্ত্রীর পিঠের উপর মুখ রেখে নিঃশব্দে শুয়ে

পড়লো। কিছুক্ষণ পর স্ত্রী ঘুরলো। চিৎ হলো। রাহাত তার মুখটি স্ত্রীর মুখের দিকে তুলে sorry বলেই মুখটা লুকালো স্ত্রীর বুকের মাঝে। মনজিলার চোখে মুখে জলবিন্দুর অস্তিত্ব এখনো রয়েই গেছে। স্বামীর মাথার চুলে আঙুল বুলাতে বুলাতে খুব শান্ত কণ্ঠে বলল, "রাগ কমেছে ?" রাহাত কোন কথা বলেনা। মনজিলা বললো, "মাথা তোল, আমার দিকে চাও।" একটু পরেই রাহাত মাথা তুলল। ফিক করে হেসে মনজিলাকে জড়িয়ে ধরলো। শুরু হলো আদর। মনজিলা চোখ বন্ধ করে চুপচাপ রইলো।

৫

ঝকমকে সকাল। গাড়ীতে উঠে বসেছে রাহাত-মনজিলা। ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল। লক্ষ্যস্থল রাহাতের শ্বশুর বাড়ী, মনজিলার বাপের বাড়ী।

গাড়ী শহরের যানজট মুক্ত হয়ে এসে উঠলো হাই-ওয়েতে। প্রশস্ত রাস্তা। দু'পাশে ছোট ছোট গাছের সারি চলে গেছে লম্বা হয়ে সড়কের শরীর ছুঁয়ে। গাছের ওপারে দু'পাশে বিস্তৃত দিগন্তজোড়া সবুজ মাঠ চলে গেছে দৃষ্টির সীমা ছেড়ে অসীমের পানে। এ পথ অনেকটাই নির্জন। থেকে থেকে বিপরীত দিক থেকে আসছে দু-একটি বাস, ট্রাক, সাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছে এদের গাড়ী।

রাহাত গোমড়া মুখে বসে আছে। রাগে ফুঁসছে। গাড়ীতে উঠার পর থেকেই গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মনজিলার সঙ্গে কথা বলছে না। তার সঙ্গে আলাপ না করে তার বাবা শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার এ দিন ঠিক করায় তার রাগ হয়েছে। রাগটা বাবার উপর যেমন-তেমন মনজিলার উপর বেশী। সে নিশ্চিত যে, মনজিলাই তার বাবাকে এভাবে দিন ঠিক করতে বলেছে। বাড়ী থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত মনজিলা তেমন কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন বুঝতে সমস্যা হচ্ছেনা যে, রাহাত রেগে আছে। তবে পুরোপুরি কারণটা উদ্ধার করতে না পারলেও এ সন্দেহটুকু সে করতে পারছে যে, সম্ভবত রাহাত তার বাবার বাড়ী যেতে ইচ্ছুক নয়, শুধু তার শ্বশুরের ভয়েই সে যাচ্ছে। মনজিলা বাইরের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য গ্লাস খুলল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ধূলা উড়ে এসে ঢুকলো গাড়ীর ভেতরে। রাহাত-মনজিলা দু'জনেই দু'হাতে চোখ-মুখ ঢাকলো। মনজিলা একহাতে চোখ ঢেকে অন্য হাতে বন্ধ করলো গ্লাস।

"জানালা খুলেছ কী জন্য ?" রাহাত ধমক দিয়ে বলল।

"বুঝতে পারিনি।" শান্ত কণ্ঠে বলল মনজিলা।

"কী বুঝতে পার তুমি, এ্যাঁ ?" রাহাতের কণ্ঠ ক্ষিপ্র।

"ভুল হয়ে গেছে আমার। আর কিছু বলনা, Please ! ড্রাইভার সব শুনছে।"

"চুপ কর ? রাহাত চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'জ্ঞান দিচ্ছ ! মূর্খ কোথাকার !"

মনজিলা আর কিছু বলল না। মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকলো। রাহাত মুখটা জানালার দিকে ঘুরিয়ে নিশ্চুপ রইল।

দুপুর নাগাদ গাড়ী এসে পৌছালো। মনজিলা গাড়ী থেকে নেমেই হাসি মুখে জড়িয়ে ধরলো বাবা-মা-ভাইকে। রাহাতও হাসি-মুখে কুশল বিনিময় করল সবার সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাড়ীতে যেন আনন্দের ঢল নামল। গ্রামের এপাড়া ওপাড়া থেকে মহিলারা আসছে। রাহাত-মনজিলাকে এক নজর দেখার জন্য।

গ্রামের হাট দেখে খুব মজা পেয়েছে রাহাত। এই প্রথমবার সে হাট দেখলো। বিকালে শ্যালকের সঙ্গে গিয়েছিল পাশের গ্রামের হাটে। রাতে ফিরেছে। এ মজা পাওয়া নিয়েই কথা বলছে রাহাত মনজিলার সঙ্গে। তাদের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে দোতলায়। পুরো দোতালা জুড়ে শুধু তারা দু'জন। খাটের বাতায় একটা বালিশ রেখে তাতে হেলান দিয়ে বসেছে মনজিলা। রাহাত মনজিলার বুকে মাথা রেখে হেলান দিয়ে বসেছে। মনজিলা পেছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে রাহাতকে।

'মন, তুমি কী করলে বিকালবেলা ?" সোহাগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল রাহাত।

"গোটা গ্রাম ঘুরেছি। প্রায় সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। খুবই ভাল লেগেছে।" মনজিলা উৎফুল্ল হয়ে বলল।

রাহাত লাফ দিয়ে উঠে বসলো। মনজিলার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, "What ? তুমি গোটা গ্রাম ঘুরেছ, আমাকে এববারও জিঙ্গাসা করেছ ?" রাহাত রাগের সাথে বলল। মনজিলা বিস্মিত হল।

"রাহাত, এটা আমার গ্রাম। এখানে সবাই ..... এতটুকু বলতেই রাহাত ধমক দিয়ে জোর গলায় বলল, "তাই বলে তুমি ঢ্যাং-ঢ্যাং করে ঘুরে বেড়াবে, আঁ ?"

মনজিলা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত জোর করে কাতর হয়ে বলল, "Please রাহাত! নিচে বাবা-মা আছেন, দয়া করে আস্তে কথা বল।"

রাহাত দৃষ্টি ফেরালো অন্য দিকে। রাগে ফুঁসছে মন, ফুঁসছে শরীর। আবারও দৃষ্টি স্ত্রীর দিকে ঘুরিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, "ইতর ! ছোটলোকের বাচ্চা !"

ভীষণ কষ্ট পেল মনজিলা। তারপরও কষ্টকে দমন করে স্বামীকে বুকের মাঝে টেনে নিতে চাইল, কিন্তু রাহাত ঝিটকানি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল। মনজিলা এসে আবারও ঝাপটে ধরল। এবার চোখে পানি এসে গেছে তার। পানির ছোঁয়া লেগেছে কণ্ঠে। কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বলল, "Please ! রাগ করনা। তুমি রাগ করলে আমি খুবই কষ্ট পাই। তুমিতো জান, বোঝ,তোমাকে কতটা ভালবাসি।" কথা শেষ করেই রাহাতকে আবারও নিজের মাঝে নিতে চাইলো সে, কিন্তু এবারও পারল না। রাহাত নিজেকে আলগা করেই থামল না, খাটের একপার্শ্বে শুয়ে বলল, "আমাকে তুমি স্পর্শ করবেনা– এ আমার আদেশ ?" মনজিলার চোখ থেকে জল ঝরছে। সে আর কিছুই বললনা। চুপচাপ কিছুটা দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়লো।

ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে গেছে রাহাতের। এখনো পর্যন্ত ঘুম আসেনি মনজিলার চোখে। বালিশে মুখ চেপে খুব কেঁদেছে সে। এখন চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে। রাহাত ঝাপটে ধরলো মনজিলাকে। চোখ খুলল মনজিলা। স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বলল, "sorry মন!" আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। এরকম আর হবেনা। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসি। তুমি আমার জান! আমার প্রাণ! সবকিছু !"– এসব বলতে বলতে রাহাত তাকে অজগরের মত জড়িয়ে-পেঁচিয়ে ধরলো। মনজিলা চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো নিথর পাথরের মত।

আরও দুইদিন বাদে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে রাহাত-মনজিলা ফিরে এল ঢাকায়।

৬

দেখতে দেখতে এক বছর পূর্ণ হল রাহাত-মনজিলার বিয়ের। আজ বিয়ে বার্ষিকী। বড় ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শহরের সব নামীদামী লোকজন আসছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবারের। এসেছে রাহাতের বন্ধু-বান্ধব। মনজিলার কয়েকজন বন্ধু এসেছে তাদের স্বামী আর স্ত্রীদের নিয়ে। ঝামেলার কারণে মনজিলার বাবা-মা-ভাই কেউই আসতে পারেনি।

অতিথিরা সবাই এসে গেছে। একটু পরেই কাটা হবে বিয়ে বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাণ্ড আকারের একটা কেক। বাড়ীর গৃহকর্তার নির্দেশমত গোধূলি লগ্নে কাটা হবে কেক। আর কিছুক্ষণ আছে বাকী। আজ মনজিলা সেজেছে নতুন সাজে। বিয়ের দিন থেকে শুরু করে এ অনুষ্ঠানের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মনজিলার যেসকল বেশ-ভূষা ছিল

সেগুলো থেকে আজকেরটা ভিন্ন ; আর চেহারা ! সে বিধাতার নির্দেশে সজ্জিত হলেও মানুষের ছোঁয়ায় পেয়েছে এক আলাদা ঢং। তিন-তিনজন ঢং-সৃষ্টিকারিনীকে ভাড়া করে বাড়ীতে নিয়ে এসেছে রাহাত। এ ঢংয়ের সাথে তাল রেখে পড়ানো হয়েছে শাড়ী। এ শাড়ী পড়ার ঢং কেমন হবে সেজন্যও রয়েছে একজন বিশেষজ্ঞ। অবশ্য এ বিশেষজ্ঞকে ভাড়া করতে হয়নি। রাহাতের বোন এ কর্মটি কারো উপর অর্পণ করতে সাহস করেননি, পাননি ভরসাও। নিজেই নিয়েছেন এই দায়িত্ব। বোনটি রাহাতের বড়। একমাত্র বোন। স্বামী আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আজ সকালে ছুটে এসেছেন চিটাগং থেকে, কাল খুব ভোর বেলা রওনা হবে আবারও চিটাগংয়ের উদ্দেশ্যে। সবকিছু মিলিয়ে মনজিলা এখন সবার কাছে অপরূপা।

মনজিলা তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে। অনেকদিন পর দেখা। তার ভার্সিটি জীবনের বন্ধু সবাই। বন্ধুদের সংখ্যা বেশ ক'জন হলেও এসেছে মাত্র তিনজন। দুই ছেলে আর এক মেয়ে বন্ধু। ওদের সঙ্গেই চলছে গল্প। রাহাত কিছুটা দ্রুতবেগে উঠে গেল দোতলায়। শোবার ঘরে এল। মাশুদাকে দিয়ে মনজিলাকে উপরে ডেকে পাঠালো।

"একটু পরেই আসছি।"– এ কথাটি রাহাতকে বলার জন্য মাশুদাকে বলে দিল। মাশুদা উপরে উঠতেই ডাক পড়লো গৃহকর্তার। মাশুদাকে অন্য একটা কাজে লাগালেন। মাশুদা ভাবছে, "অল্প এ্যানা সময় ল্যাগবে, ক্যরাই ভাইয়োক খবর দিই। একনার জন্যে কিছু হবেনা।"

মিনিট তিনেক পর রেগেমেগে নিজেই মনজিলাকে ডাকবে ভেবে ঘরের বাইরে পা ফেলতেই মনজিলা হাজির হল। স্বামীকে দেখেই হেসে ফেলল। কিন্তু স্বামী হাসল না। মনজিলাকে হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কতক্ষণ লাগে উপরে আসতে ?"

"আমিতো মাশুদা----- এতটুকু বলতেই কথা কেড়ে নিয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠলো, "চুপ কর ? কিসের মাশুদা ?" রসগল্পে মেতে উঠেছ, আমার আর খেয়াল থাকবে ?"

"বাড়ী ভর্তি অতিথি, আস্তে কথা বল।" মনজিলা শান্ত মেজাজে বলল।

"থামো ? আর জ্ঞান দিতে হবেনা ?" কথা শেষ করেই বারান্দায় আসলো। দু'হাতে গ্রিল ধরে দাঁড়ালো। মনজিলা শাড়ীর আঁচলে চোখের কোণে জড়ো হওয়া

অশ্রু-ফোঁটা মুছে স্বামীর পেছনে এসে দাঁড়ালো। আলতো করে হাত রাখলো স্বামীর পিঠে।

"মনজিলা ..... রাহাত..... কোথায় তোমরা ? কেক কাটার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এস।" বাবার কণ্ঠ ভেসে এল। রাহাত মনজিলার দিকে না চেয়ে সামনে পা বাড়ানোর সময় আস্তে করে বলল, "চলো।" মনজিলা পেছন পেছন চলতে লাগলো।

৭

অনুষ্ঠান যথারীতি শেষ হল। রাত পার হল। এসেছে এক রৌদ্রময় ঝকমকে সকাল। আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তারা খুব সকালে বিদায় নিয়েছে। রাহাত নিচে ডাইনিং রুমে বসে অফিসের কাজ করছে। মনজিলা তার বাবার দেয়া শাড়ী পড়ে এসে দাঁড়িয়েছে রাহাতের সামনে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

"কোথাও যাচ্ছ নাকি ?" রাহাত জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ।"মনজিলার মুখটা ভার। তবে কণ্ঠধ্বনি স্বাভাবিক।

"কোথায় ?"

"বাবার বাড়ী।"

"বাবার বাড়ী ! কী বলছ ?"

"হ্যাঁ, আমি চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি বাবার বাড়ী।"

"কী বলছ ? কেন ?"

"উত্তরটা তোমারই ভাল জানার কথা।" রাহাতের বাবা তাঁর ঘর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছেন। বৌমার কথায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

"কিন্তু হঠাৎ করেই তুমি এমন করবে ?"

"এটা কি হঠাৎ।" রাহাত উঠে দাঁড়ালো।

"মনজিলা, আমি তোমার সঙ্গে সময়ে অসময়ে খারাপ আচরণ করি ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে আমাকে শুধরানোর সময় দিবেনা ? আর আমি তোমাকে কি ভালবাসিনা, মনজিলা ?"

'না, তুমি আমাকে এতটুকুও ভালবাসনা। তুমি ভালবাস শুধু আমার দেহকে। পান থেকে চুন খসলেই তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছে– তাই আচরণ কর, পরক্ষণেই ছুটে আস দেহের টানে; নিজেকে তৃপ্ত করে আবার ফিরে যাও আগের মূর্তিতে। পুরো একটা বছর

তুমি পেয়েছ নিজেকে শুধরানোর জন্য, কিন্তু এক মুহূর্তও ভাবার প্রয়োজন মনে করনি।"

"বিশ্বাস কর মনজিলা, আমি কখনো এভাবে ভাবিনি, বুঝিনি, কিন্তু তুমিতো আমাকে বুঝাতে পারতে। আজ যেমন করে বুঝালে তার একটুও যদি আগে করতে, আমি ঠিক হয়ে যেতাম।"

"তোমার যেকোন কিছুর বিপরীতে ছিল আমার ভালবাসা। ভালবাসা দিয়ে যাকে ভালবাসতে শেখানো যায়না তাকে অন্য কিছু দিয়ে আর যাই হোক ভালবাসতে শিখানো যাবেনা। আর যে সংসারে ভালবাসা নাই সেখানে মনজিলা থাকবেনা। তুমি চাইলেই আমাকে ডিভোর্স দিতে পার, এটা পুরোটাই এখন তোমার ব্যাপার ; আমি দিবনা কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।" শেষ শব্দটি উচ্চারণকালে তার চোখে ছুটে এল জল। কণ্ঠও উঠেছে ভিজে। মনজিলা বাবার রুমের দিকে আসতেই তিনি বের হলেন। বাবার চোখে জলরাশির খেলা দেখে আর কোন বাধা মানলোনা তার অশ্রুজল- ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়লো।

"মা, আজ যে পূর্ণিমা!" বাবা বললেন।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মনজিলা বলল, "বাবা, আজ থেকে তোমার আমার সকল রাত হবে পূর্ণিমার রাত। আর মায়ের কাছে ছেলে যাবে- এটা ঠেকানোর শক্তি কি আছে ? চলি বাবা।"

বাবা মনজিলার মাথায় হাত রাখলেন। মনজিলা বাবার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দ্রুত চলে এল বাড়ীর বাইরে। রাহাতের চোখের কোণ থেকে টপ করে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। সে নির্বাক হয়ে চেয়ে আছে মনজিলার চলে যাওয়া পথের দিকে।

অপরাধ

১

বেশ জমে উঠেছে মেলা। কালীপূজার মেলা। শেষ দিন বলে মেলার ভেতর-বাইর সবখানে মানুষের ব্যাপক আনাগোনা। আশেপাশের সব গ্রাম থেকে এসেছে চ্যাংড়া-জোয়ান থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। আর নারী ? না, তাদেরও কোন কমতি নাই।

আমি চ্যাংড়ার দলে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র– হিসাব-নিকাশে লোকজন একটা পর্যায়ে ফেলতো বলে নিজেকে কিছুটা গর্বিত বোধ করতাম। যা হোক আমরা তিন বন্ধু এক সঙ্গে মেলায় এসেছি, থাকবও এক সাথে, আবার ফেরার বেলায়ও তাই। কেন জানিনা, এখনো পর্যন্ত সময় ও সুযোগের মিলন ঘটলেই আমরা মিলিত হই, যদিও মিলনের আগে-পরে আর কোন মিলন হয়না। আমাদের কাছে মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল দুটি– এক, শিব আর কালীর প্রকাণ্ড মূর্তি, বিশেষ করে স্বামী শিবের বক্ষের ওপর অজ্ঞাতসারে স্ত্রী কালী উঠে পড়ায় তার দাঁতে চাপা লজ্জাস্নাত জিহ্বাংশটি আমাকে প্রায় সময় ভাবাতো যে, কালী নৈতিক ; এখনো যে ভাবাইনা তা অস্বীকার করতে পারবনা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গরম-গরম জিলাপী। আহ্ ! সত্যিই আমার জিভ এইমাত্র রসালো হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যত কৌশলে যত আদর ভালবাসা দিয়ে জিলাপী ভাজা হোকনা কেন, মেলার জিলাপীর মত যে তা অত স্বাদ-আহ্লাদের হবেনা তা নিয়ে আমি যেকোন তর্কে যেকোন প্রতিযোগিতায় নামতে এক পায়ে খাড়া।

২

শিব-কালী দর্শন হল। এবার জিলাপী-পর্ব। আর কোনরকম দেরী সইছিলনা। মনে হচ্ছিল সব জিলাপী বুঝি শেষ হয়ে গেল ! কত দ্রুত যাব জিলাপীর রাজ্যে, কত দ্রুত কিনবো, কত দ্রুত মুখে দিব– এই উত্তেজনায় তিন জনে ভিড় ঠেলে এর ওর ধাক্কা খেয়ে একমত দৌড়েই এলাম জিলাপীর দোকানে। কিন্তু একি অকস্মাৎ উৎপাত! এ কোন ঝামেলা! তিনজনে এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। জিলাপী কিনবো কি-না, এ নিয়ে দ্বিধায় পড়লাম। সবারই মেজাজটা বিগড়ে গেল। অবশেষে সরে

আসলাম শূন্য হাতে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতেও পারছিলাম না–শুধুই চোখ চাওয়া-চাওয়ি, আর সবাই রাগে ফুঁসছিলাম ভেতরে ভেতরে। মনে মনে বলছিলাম, "এসব ছেলে-পেলের মেলায় আসার দরকারটা কী ? ফকিরের দল সব !" কিন্তু জিলাপিতো খেতেই হবে! এক নিমেষ দেরী আর সইছিলনা। আরো কিছুক্ষণ অমনিভাবে থাকার পর তিনজনে ফিসফিস করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আবারও এলাম দোকানে। জিলাপী কিনে নদীর পাড়ের দিকে আমরা পা বাড়ালাম। চার-পাঁচ ধাপ দেয়ার পর আমি চাইলাম পেছনের দিকে-দেখি, তালেব আর এগোয়নি, সে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকে; আমরা নিশ্চিন্ত মনে পা চালাতে লাগলাম।

আজ এত বছর পর তালেবের সেই চাহনী ..... স্তব্ধ হল কলম ; কবীর সাহেবের দু'চোখ বেয়ে অবলীলায় গড়িয়ে পড়ছে জল ডায়েরীর পাতায়।

কিছু সময় পর তিনি আবার ধরলেন কলম।

"আজ আমি হয়েছি কবীর সাহেব– কিন্তু এই সাহেবীর মূল্য যে কী তা তালেবের চেয়ে আর কে ভালো জানে ?"

এবারও থামলো কলম। কবীর সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে কিছু সময় চেয়ে থাকলেন প্রকৃতির পানে। চোখ মুছে ফেললেন। আবারও ধরলেন কলম– "তালেব, আমি আসছি সামনের মেলায়– শুধু তোর পা-দুটো যেন অক্ষত থাকে।"

স্পৃহা

১

মিটিং বসেছে। পরিবারিক মিটিং। বড়, মেজ, ছোট– তিন ছেলেই উপস্থিত। সঙ্গে তিনজনের সহধর্মিনী। ছেলেরাই ডেকেছে মিটিং। একমাত্র বোন সাজেদা বেগম আসেনি। তারা সবাই মা--- মা--- বলে ডাকছে সালেহা বেগমকে মিটিংয়ে আসার জন্য। সালেহা বেগম ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে আছেন দেয়ালে টাঙ্গানো স্বামীর ছবির দিকে। থেকে থেকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। দু-এক ফোঁটা জল জমেছে চোখে। 'একটা মানুষ ম্যরা যাওয়ার সাতে সাতে কী হ্যয়া গেল এই বাড়ীত! ব্যাবাকে ভিন্ন হ্যয়া গেল যার যার মতন। জমি ভাগ হ্যয়া গেল। এ্যাকুন খালি হ্যামি বাঁকি! হামাক এইভাবে থিয়া গেলেন ক্যান তুমি ?' শেষ বাক্য উচ্চারণকালে সালেহা বেগমের চোখের দেয়াল আর ঠেকাতে পারল না জল-কনার ধাক্কা। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বাইরে এলেন।

ছোট ছেলের বউ ফিসফিস করে স্বামীকে বলছে, "যে করেই হোক মা'কে আমাদের সঙ্গে নিতেই হবে, নচেৎ আমাদের সোনামনিকে নিয়ে খুব ঝামেলা হবে।"

স্বামী বললো "জানিতো।"

"আবারও মনে করিয়ে দিলাম।" স্ত্রী একটু বড় বড় চোখে বললো।

মেজ ছেলের বউ স্বামীকে কানে কানে বলছে, "যেমন করে পার মা'কে সাঈদের সঙ্গে ঢাকা পাঠাও। বয়স্ক মানুষ, ওখানেই ভাল থাকবে।"

বড় ছেলের বউ স্বামীকে ফিসফিসিয়ে আবার স্মরণ করিয়ে দিল বিষয়টি– "ওরা যতই টানাটানি করুক মা'কে, আমাদের মধ্যে নিতে হবে। তোমার আমার চাকরী, ভাত-তরকারী রান্না করার কী যে ঝামেলা!"

সালেহা বেগম এসে বসেছেন সবার কাছ থেকে দু-এক হাত দূরে একটি চেয়ারে।

"তাহলে কথা-বার্তা শুরু করা যাক। আমি তোদের বড় ভাই, বড় ছেলে, তাই মার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য আমারই বেশী– মা এখন থেকে আমার বাড়ীতেই থাকবে। তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার।"

"আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় কথা হচ্ছে, মা'র বয়স হয়েছে, এখন প্রায়ই ডাক্তার দেখানো দরকার, তাই আমার সঙ্গে মা ঢাকায় থাকলে চিকিৎসার কোন সমস্যা হচ্ছেনা, মা ভাল থাকবে। আপনি, মেজ ভাই যখন মন চাইবে দেখে আসবেন, অন্যদিকে মা'ও মাঝে মাঝে বাড়ী এসে ঘুরে যাবে। মেজ ভাই, আপনি কী বলেন?" ছোট ভাই বলল।

"হ্যাঁ ----- আমারতো মনে হয় সাঈদ ঠিকই বলেছে বড় ভাই। মা ভাল থাকলেই আমরা ভাল থাকবো। মা'র ভাল থাকা জরুরী।"

"কেন? এখানে কি চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই ?" বড় ভাই বললেন।

'গ্রামের চিকিৎসা দিয়ে কি আর মানুষকে সুস্থ্য রাখা যায় ? এগুলো সাময়িক চিকিৎসা, রুগীর আরো ক্ষতি করে। ঢাকায় বড় বড় ডাক্তার। সুযোগ থাকতে গ্রামের চিকিৎসা কেউ করায়? বড় ভাই, আপনি আর না করেন না"–বলেই সে ভাইয়ের হাত চেপে ধরলো। মেজ ভাইও সাঈদের কথায় সায় দিয়ে আবারও বলল "ভাই, সাঈদ ঠিকই বলেছে। আপনি রাজী হয়ে যান।"

মা'কে নিজ বাড়ীতে রাখার ইচ্ছা বড় ভাইয়েরও নাই। তিনিও চান তাদের মা ঢাকা থাক। শুধু স্ত্রীর ইচ্ছার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েই তিনি এতদূর এগিয়েছেন। কিন্তু সব হিসাব-নিকাশ শেষে কোন দোষ ছাড়াই যখন সুযোগ চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন সেটিকে বধ না করাটাই তিনি দোষের মনে করছেন। তার মনের ভেতরে হেসে উঠছে অবলীলায় আরেক মন। তিনি তীব্র ভারাক্রান্ত মনে প্রচণ্ড আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "যা, নিয়ে যা------ সবসময় মা'র দিকে লক্ষ্য রাখিস।"

ছেলেদের কথা সালেহা বেগম এতক্ষণ মনোযোগের সাথে শুনলেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অসহায় দৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিলেন তিন ছেলের দিকে। তিনি আর এখানে থাকতে পারছেন না। চোখের ভেতরটা ছলছল করছে। তিনি উঠে ঘরে এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে দাঁড়ালেন স্বামীর ছবির সামনে। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলধারা।

২

পরদিন সকাল। সাঈদ সমস্ত জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়েছে ঢাকার উদ্দেশ্যে। সালেহা বেগমের মন আজ বিধ্বস্ত। মনের দহনের শিখা মুখ পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। সকাল

থেকে কিছুই মুখে তোলেননি। সকাল এখন প্রায় ন'টা। তিনি ভোরে উঠেছেন। নামাজ সেরেছেন। তখন থেকে এতক্ষণে মাত্র একবারই ঘরের বাইরে এসেছেন। শুধু ছোট আর মেজ ছেলের বউয়ের তাগাদার কারণে কাপড় পাল্টিয়েছেন। নামাজ পড়ার সময় খুব কেঁদেছেন। এখনও কান্না মনের ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর স্রোতের মতই, ছেলে-বউদের ভয়ে মনের বাঁধ ভেঙ্গে বাইরে আসতে পারছে না। তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকছেন ছবির দিকে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে শ্রদ্ধাভরে রক্ষিত স্বামীর নামাজ পড়ার টুলের দিকে। তাঁর দিকে তেমন কেউই লক্ষ্য করছেনা, আবার করলেও কোন গুরুত্ব দিচ্ছেনা। আবার কেউ কেউ দিলেও না দেখার ভান করছে। এখন পর্যন্ত কেউ তাঁকে খাওয়ানোর তেমন চেষ্টা করেনি। শুধু ছোট ছেলে একবার খাওয়ার জন্য সেধেছিল সেই ঘন্টাখানেক আগে। তিনি বলেছিলেন, "ক্ষিদা নাই।"

ছোট ছেলের বউ দমদম করে ঘরে ঢুকলো।

"আম্মা, আপনার সব গুছিয়ে নেয়া হয়েছে? চলেন, বের হই। হায় আল্লাহ্! চুলে তেল দেননি কেন ? দেখি, এদিকে আসেন, এখানে বসেন।" মাথায় খুব সুন্দর করে তেল ঘষে চুলগুলো ভালভাবে আঁচড়িয়ে দিয়ে ছোট বউ সালেহা বেগমকে নিয়ে বাড়ীর বাইরে এল। এক মুহূর্ত দেরী না করে তারা পা বাড়ালো নদীর ঘাটের দিকে। কিন্তু সালেহা বেগমের পা আর উঠতে চাইছেনা। যেন মাটি চেপে ধরছে তাঁর পা। এবার মনের বাঁধ আর রক্ষা হলনা। মন ভেঙ্গে চোখ ভেঙ্গে জল গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। সবাই এটা দেখলেও না দেখার ভান করলো। কিছু পথ চলার পর সালেহা বেগম দাঁড়িয়ে গেলেন। তিন ছেলে, তাদের স্ত্রী এবং প্রতিবেশীদেরও কয়েক জন দাঁড়িয়ে গেল। তিনি দৃষ্টি ঘুরালেন পেছনের পানে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বাড়ীর দিকে। কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ফেরালেন। সামনের দিকে পা তুলতেই পড়ে গেলেন।

কেউ গেল ডাক্তার বাড়ী, কেউ পানি আনতে, কেউ ভ্যান-গাড়ি ঠিক করতে। সেজ ছেলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর মা-মা বলে ডাকছেন, অন্য দুই ছেলে জলভেজা চোখে কেউ মাথা নাড়ছে, কেউ পা টিপছে। স্ত্রীরা কেউ বাতাস করছে, কেউ পায়ের তলায় তেল মাখছে, কেউ পালস্ দেখছে। প্রতিবেশীরা সবাই একরাশ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে সালেহা বেগমের দিকে। সবার চোখে-মুখে এখন একটাই শঙ্কা– সালেহা বেগম ফিরবেনতো!

বিরহ

১

দরজা খুলে গেল। কে দরজা খুললো শিপন জানেনা। দীপা ঢুকছে ঘরে। সেই দীপা। তার দীপা। সে অবাক হল। কেমন করে হল এটি। সে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমনতো কথা ছিলনা। সে আসবে কেন। তাকে কথা বলতে, তার কাছে আসতে সে নিষেধ করেছে। দীপা হাসছে। ঠোঁটভরা হাসি। আরো সুন্দর হয়েছে সে। চুলগুলো চিকচিক করছে। যেন এইমাত্র শ্যাম্পু করেছে। চোখ জোড়া আরো টানাটানা হয়েছে। যেন নতুন করে বিধাতা দান করেছেন। আজ সে শাড়ী পড়েছে। লাল-কালোয় মিশ্রিত শাড়ী। শিপনের পছন্দের শাড়ী। শিপনের চোখে শুধুই বিস্ময়– সত্যিই কি দীপা! হ্যাঁ, দীপাইতো। তার সংশয় কেটে গেল। দীপা ধীর পায়ে এসে বসলো শিপনের মাথার কাছে। শুয়ে আছে শিপন। চিৎ হয়ে। দীপাকে দেখে তার রাগ হচ্ছে। রাগের সঙ্গে ঘৃণাও। মনে গালি আসছে। প্রকাশ ঘটাতেও চাচ্ছে, কিন্তু কেমন করে যেন বলতে পারছেনা। "নির্লজ্জ! বেহায়া! এতটুকু লজ্জা থাকলে কেউ এমন করে আসতে পারে!" আপাতত এটুকু মনে মনে বলতে বলতেই ক্ষান্ত থাকলো সে। দীপা হাত রাখালো মাথায়। আঙুলগুলো চুলের ভেতর ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করছে। শিপন হাতটি সরিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু পারল না। কী যেন এক শক্তি তার রাগকে গ্রাস করলো। কী যেন এক ছোঁয়া তার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। কী যেন এক সান্ত্বনা তাকে আশ্বস্ত করলো। শিপন নিশ্চুপ। দীপা আর একটু ঝুঁকে পড়লো তার দিকে। তার চুলগুলো ঢেকে ফেললো শিপনের মুখমন্ডল। যেন রোদ্রজ্জ্বল দুপুরে হঠাৎ এক খণ্ড কালো মেঘের হানা। সে দীপার চুল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। দীপার মুখ হঠাৎ নেমে এল শিপনের মুখের ওপর। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে চলছে সংঘর্ষ। দূরত্বটা তাদের একান্ত, তা মাপার অধিকার শুধু তাদেরই। শিপন কিছুই বলতে পারছে না। সে ক্রমে ক্রমে কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ছে। একটা আকর্ষণ একটা ভাললাগা ধীরে ধীরে ভর করছে তার উপর। তার চোখে-মুখে সর্বত্র ছুঁয়ে যাচ্ছে দীপার আঙুল। দীপা দেখছে। কী দেখছে তা তারই জানা। দীপার গরম নিঃশ্বাস বয়ে যাচ্ছে শিপনের শিরায়-উপশিরায়। গোটা শরীরে শুরু হয়েছে এক ধরনের আন্দোলন। অনেকটা জ্বালাও-পোড়াও– এর মত।

শিপন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল দীপাকে। দীপা একটু আলগা হল। হাসতে লাগলো নিঃশব্দে।

"কেন এসেছো ?"

"তোমাকে আদর করতে, ভালবাসতে, প্রেম দিতে----- বলেই সে জড়িয়ে ধরলো শিপনকে।

"সরে যাও দীপা? তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি বিশ্বাসঘাতক।" শিপন তাকে সরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে।

"না, আমি সরবনা? এ আমার অধিকার!" বলতে বলতে সে শিপনের ঠোঁটে-মুখে-চোখে সবখানে আদর করতে লাগলো। শিপন আরো দু-একবার সরানোর চেষ্টা করে অবশেষে স্থির হল। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। অনেকটা জড় পদার্থের মত।

সে দীপাকে আর বাধা দিতে পারছেনা। দীপার প্রতি তার দুর্বলতা সজীব হয়ে উঠেছে। সেই দুর্বলতা, আজ থেকে চার বছর আগের; সেই প্রেম, যখন দীপা ছাড়া আর সে কিছুই বুঝতনা।

দীপা শিপনের মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললো, "কেমন আছো।"

"তোমাকে ছাড়া ভাল থাকব কীভাবে।"

"আমি খুব কষ্টে আছি। তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত ভাল লাগেনা। সহ্য করতে না পেরে আজ চলে এসেছি। আমাকে নিবে তুমি ?"

"তুমি সেদিন সব ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলেনা কেন ?" কথাটি শিপন জিঙ্গাসা করবে এমন সময় স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল তার, ভেঙ্গে গেল ঘুম। ডেকে উঠলো– 'দীপা---!' লাফ দিয়ে উঠে বসে সে। তাকায় ঘরের ভেতর এদিক ওদিক। কোথাও নাই দীপা। ঘোর ঘুচলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল স্বপ্নের কথা। মাথার চুলগুলো দু'হাতে চেপে মাথা নিচু করে রইলো।

রাত একটারও বেশি হবে। শিপন আর কিছুতেই ঘুমাতে পারছে না। কিছুক্ষণ আগে দীপা মেরে ফেলেছে তার ঘুমকে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো। বসলো বারান্দায় পেতে রাখা একটি চেয়ারে। সিগারেট ধরালো। তার সমস্ত মন জুড়ে এখন দীপা। হঠাৎ করেই তার মনে পড়ে দীপার কথা। সে এসে নোঙর করে তার মনে। অশান্ত হয় মন। আবার কোন এক সময় ম্লান হয় দীপা, বিস্মৃত হয় তার স্মৃতি। স্বপ্ন যে স্বপ্নই, দীপা এভাবেই আসবে-যাবে, এ কষ্ট নিয়েই বাঁচতে হবে, এটাই জীবন–

এসব ভেবে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। দীপা যেন এগুলোর চেয়ে অধিকগুণ শক্তিশালী। সে এক নিমেষের জন্যও তাকে সরাতে পারছেনা মন থেকে। সে নিরলসভাবে টেনে চলেছে সিগারেট। চোখের কোন এক কোণ থেকে কখন যে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়েছে সে খেয়ালই করেনি।

অস্থির হয়ে উঠেছে শিপনের মন। মনের খাঁচা ভেঙ্গে আপনমনে বেরিয়ে আসে শব্দগুলো– "দীপা আর কত কষ্ট দিবে আমাকে ? আমাকে ভালবেসেও বাবা-মার কথায় বিয়ে করেছ অন্যকে। আমার সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন মনে করনি। আমিতো সবকিছু মেনে নিয়ে দূরে আছি। তোমার মোবাইল নাম্বার থাকা সত্ত্বেও কখনো ফোন করিনা। বিয়ের পরদিন যখন কল করলে সেদিনই তোমাকে নিষেধ করেছি আমাকে কল না করতে। তারপরও তোমার কল বন্ধ না হওয়ায় আমি সিম পর্যন্ত চেইঞ্জ করেছি– এরপরও তুমি কষ্ট দিবে আমাকে ? তুমি কেন বুঝতে পারনা যে, তোমাকে দেখা তো আরও বড় বিষয়, তোমার কণ্ঠ আমার কানে আসলে আমি অস্থির হয়ে উঠি, সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এই যে একটু আগে দেখা দিলে, আমি এটিকে আর কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছিনা– তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে কথা বলতে, স্পর্শ করতে। O' Deepa, I can't bear ! I can't----!"

সে আরো অস্থির হয়ে উঠলো। এ অস্থিরতা বয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতই তার মনের এপার থেকে ওপার। দীপাকে ছাড়া তার অসহায় লাগছে। দেখছে চারপাশে হাহাকার, দেখছে শুন্যতা। সে সামনের গ্রিলে পা ঠেস দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো দীপাকে।

আজ রাতের আকাশের রং স্থির নয়– কখনো শাদা কখনো ঘোলাটে, কখনো মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ গুচ্ছ-গুচ্ছ হয়ে এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করছে। চাঁদও বিদায়ের পথে। চারপাশে নীরবতা। শুধু দূর থেকে রাজপথে দ্রুতগমী যানের শব্দ ভেসে আসছে। প্রকৃতি আজ একটু অগোছালো হলেও এক ধরনের মিনমিনে বাতাস বইছে সারাক্ষণ।

শিপন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে। সে দীপার সঙ্গে দেখা করবে। সে ফোন করতে নিষেধ করার পরও দীপা বলেছে, শিপন চাওয়া মাত্রই সে তার সঙ্গে দেখা করবে, কথা বলবে। অবশ্য দীপার এ কথাটির ওপর ভর করে শিপনের যাত্রা নয়, তার দেখা করতে হবে– এটাই শেষ কথা। এরকম সিদ্ধান্তে আসার পর তার মনের অস্থিরতা অনেকটাই

কমেছে। আর একটি সিগারেট ধরালো। সিগারেট টানছে আর মনে মনে বলছে "দীপা, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এতটুকুও কমেনি। আমাকে তুমি কতটা ভালবেসেছ কিংবা এখনো বাসো কি-না তা তোমারই জানা, কিন্তু আমার ভালবাসা নিখুঁত আর সেজন্যই এত কষ্ট আমার।"

পার্কে ইউক্যালিপটস গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দীপা। কাছেই একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শিপন। দীপা তাকে দেখতে পাচ্ছেনা, কিন্তু সে তাকে দেখছে। দীপা ডানে-বাঁয়ে– সামনে চোখ মেলছে তার খোঁজে, কখনো পেছনে ঘুরে– এটা দেখতে খুব ভাল লাগছে শিপনের। দীপার চোখে-মুখে রাগের ছোঁয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। এটি দেখে খুব মজা পাচ্ছে শিপন। সে বার বার মোবাইলে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিন্তু শিপন মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। এতে আরো ক্ষিপ্ত হচ্ছে সে। এবার শিপন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখা মাত্রই দীপার রাগ চরমে উঠলো। শিপন প্রেমের পরশে আস্তে আস্তে দূর করলো সেই রাগ। হেসে উঠলো দীপা, হেসে উঠলো শিপন--- মনে মনে বলে, "এখন কি আর রাগ করবে তুমি! এখন কি আর তুমি আমার দীপা!"

দীপাকে নিয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগছে শিপনের। ঠিক করেছে, আজ ভোর পর্যন্ত সে তাকে নিয়ে ভাববে। খুলে দিবে আজ মনের কারাগার, বেরিয়ে পড়বে সেই দিনগুলো। সকাল হলেই সে ফোন করবে দীপাকে। চার বছর পর হবে কথা, তারপর দেখা– জমে থাকা কষ্টের হবে দাফন। এ আনন্দে সে এখন আত্মহারা। দীপার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে– এটিই এখন তার স্বপ্ন, এটিই সবচেয়ে বড় কথা, এটিই ব্রত। তারপর কী হবে নাহবে তা নিয়ে সে আর ভাবতে চায়না।

দীপাকে নিয়ে ভাবনার জগতে ডুবে যাওয়ার আগে সে একবার তাকে দেখে নিতে চায়– জীবন্ত দীপা নয়, তার ছবি। ছবিটি নেয়ার জন্য সে ঘরে এল। অনেকদিন দেখেনি সে ছবিটি। অতি সযত্নে, অতি গোপনে রক্ষিত আছে ছবিটি। সে আর বিধাতা ছাড়া তার সন্ধান আর জানেনা কেউ। ছবিটি হাতে নিয়ে বারান্দায় ফিরে আসতেই চোখ পড়লো বিছানায়– সেখানে মায়ের পাশে শায়িত তার আট মাসের একমাত্র ছেলেটি তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। তার চোখ পড়তেই সে হেসে উঠলো। সে স্থির হয়ে চেয়ে আছে ছেলের দিকে। এক পর্যায়ে সেও হাসলো। বাবার হাসিতে সন্তান আরো উল্লসিত হল। সে ছবিটি স্বস্থানে রেখে ছেলেকে নিয়ে বারান্দায়

এল। কিছুক্ষণ আদর করে ছেলেকে বুকের মাঝে চেপে ধরে তার মাথায় ঠোঁটযুগল নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে রইলো।

এদিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে অর্ধাঙ্গিনীর। ঘরে এদের না দেখে সেও বেরিয়ে এল বারান্দায়। এদেরকে এভাবে দেখে সে অবাক হল। কাছে এল। একটা চেয়ার টেনে পাশে বসে হাত রাখলো স্বামীর মাথায়। জানতে চাইলো, "তোমরা এভাবে এখানে কেন?"

"ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ করে। দেখি, এরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই দু'জনে এখানে বসে আছি।"

মাথার চুলে আলতো করে আঙুল বুলাতে বুলাতে স্ত্রী ঠোঁটে এক চিলতে হাসি নিয়ে বলে, "মন খারাপ হয়েছে কোন কারণে ?"

"না, এমনিই।"

"আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছো ?"

শিপন স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে স্মিত হেসে বলে, "তোমার কি তাই মনে হয় ?"

"আমাকে তুমি বিশ্বাস করনা ?"

স্ত্রীর এই পাল্টা প্রশ্নে শিপন কোন উত্তর করল না। স্ত্রীও আর কিছু বলল না।

শিপন দেখছে, স্ত্রী আর বাচ্চা মিলে তার মনের চারপাশে গড়ে তুলেছে মধুর প্রেমের এক নিষ্পাপ দেয়াল।

অন্যদিকে দেখছে, আপন মহিমায় উদ্ভাসিত দীপা অনায়াসে এ দেয়াল ভেদ করে পা ফেলেছে তার মনের আঙিনায়।

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে সে তাকায় স্ত্রীর দিকে। হেসে জড়িয়ে ধরে স্ত্রী আর ছেলেকে।

সম্ভবত চাঁদের শেষ আলোটুকু এসে পড়েছে তার চোখে– চোখের জমিনে জড়ো হাওয়া ক-ফোঁটা জল রূপালী আলোয় চিকচিক করছে।

ক-ফোঁটা জল

১

সকালের নাস্তা করা হয়নি অনীকের। সময়ের অভাব। সবকিছু তৈরীই ছিল, কিন্তু সময় বন্ধু হয়ে দেখা না দেয়ায় সেই খাবার গ্রহণে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। তাই অফিসে পৌঁছে কাজের এক ফাঁকে তাকে নাস্তা সারতে হল। আজ অনেক কাজ তার। বিকাল পাঁচটা নাগাদ একটানা কাজ করলেও হয়ত শেষ হবেনা। তাই কলম চলছে দ্রুত। এক মনে, এক ধ্যানে সে নিবিষ্ট হয়েছে কাজের মাঝে।

এমন সময় পূর্ণ যৌবনা এক নারী ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো তার দরজার সামনে। উচ্চতায় দরজার উপরিভাগ স্পর্শ না করলেও যেটুকু ব্যবধান আছে সেটুকু আসলে ব্যবধান নয়, তা তার ঔচিত্য। হঠাৎ ঘরের আলো কিছুটা হ্রাস পেল– রৌদ্রজ্জ্বল দুপুরে হঠাৎ একখণ্ড মেঘের আবির্ভাবে এ ধরায় যে ছায়া দৃশ্যত হয় অনেকটা সেইরকম। পরনে হলুদ শাড়ী; দেহের রঙে কাশফুলের সমাহার; কোমর পর্যন্ত দুলানো কেশ-রূপে তার অমাবশ্যার ঝলক; পটলচেরা নীল চোখে এক ধরনের নীরব অভিমান; মেহেদী রঙে রাঙানো দুটি ঠোঁটে শত সহস্র অনুরাগ; শরীরের প্রতিটি বাঁকে এক দুর্নিবার আকর্ষণ; সযত্নে সুরক্ষিত শরীরের প্রতিটি সম্পদ যেন এক একটি ফুটন্ত গোলাপ। সে স্থির নয়নে, স্থির চিত্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে অনীকের ওপর। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বিধাতার তৈরী এক স্বগীয় মূর্তি যে কিনা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে অনীককে দেখার জন্য– এ দেখা যেন শেষ হবার নয়। যেন অনন্তকাল ধরে সে দেখতে চায়।

অনীক এখনো টের পায়নি যে, দরজায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনমনে করে যাচ্ছে তার কর্ম।

আরো কিছুক্ষণ থেকে সে নম্র, ভদ্র, মিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলো, "একটু সময় হবে কি?"

বাম হাতের আঙুলগুলো একইসঙ্গে তাকে ভেতরে আসার ও বসার অনুমতি দিল। ওদিকে মাথা রয়েই গেল স্বস্থানে, কলম ছুটে চলেছে নিরলস গতিতে। সে নিঃশব্দে এসে তার টেবিলের সামনের চেয়ারে মুখোমুখি বসলো। আবারও চুপচাপ, দৃষ্টি মেললো তার দিকে। কিন্তু না------! অনীক দৃষ্টি ফেরায় না। সে যেন আজ কাউকে

চেনেনা কাজ ছাড়া। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু কাগজপত্র। সেখান থেকে একটি পাতা তুলে নিল সে। হ্যাঁ, যা ছিল তাই, এতটুকুও বদলে যায়নি লেখা, অবিকল সেই আগের চেহারা-রাত তখন নয়টা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মন একদম ভাল ছিলনা। ঘরে শুয়ে কী যেন ভাবছিল। অস্থির মন কোথাও ঠাঁই হচ্ছিল না। বিছানা ছেড়ে এল বারান্দায়। হাত ছোঁয়ালো বৃষ্টির পানিতে। নরম ভেজা প্রকৃতির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। কিন্তু এসবের কোন কিছুতে শান্ত হল না মন। আবারও সে ঘরে ফিরতে চাইলো। ঘরে ঢুকতেই দরজার এক কোণে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরা চোখে পড়লো। দ্রুত তুলে নিল। "মেরী, আমার ফিরতে রাত হবে। বারান্দার টেবিল থেকে আমার খাবারটা তুলে তোমার ঘরে রেখ।" নিচে তিন বর্ণের একটি শব্দ 'অনীক'। সঙ্গে সঙ্গে মন ভাল হয়ে গিয়েছিল তার। সে স্মিত হেসে পাতাটি স্বস্থানে রেখে তৃতীয়বারের মত চাইলো অনীকের দিকে। বিধাতা বোধহয় অনীককেও এবার চোখ তোলার নির্দেশ দিলেন। সে চোখ তুলতে তুলতে বললো, "বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি ?" বলেই নিজ কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতেই থমকে গেল চোখ, থমকে গেল মন। অতি দ্রুত উঠলো চোখ, দৃষ্টি হল প্রসারিত, অবশেষে তা স্থবিরও হল ----বিস্ময়! বিস্ময় আর বিস্ময়ের খেলা! এ কী দেখছে সে ! কাকে দেখছে! এভাবে কি দেখা হওয়ার কথা ছিল? কখনো কি সে ভেবেছিল একটি বার? তার বিস্মিত চোখে বিস্মৃত স্মৃতির খেলা। দু'জনের চোখ দু'জনের প্রতি নিবেশিত– নিশ্চল, অটল। ওদিকে অনীকের দিকে উন্মীলিত চোখজোড়ায় নাই কোন বিস্ময়– সেখানে এক ধরনের স্বাভাবিকতা, এক ধরনের স্পষ্টতা, এক ধরনের অধিকার জ্বলজ্বল করছে।

হঠাৎ অনীকের বিস্ময়াপন্ন চোখ ঝলসে উঠলো– চোখে-মুখে-ঠোঁটে তড়িৎ গতিতে প্রবাহিত হল হাসির ঝলক, সশব্দে হেসে উঠলো অনীক। কিন্তু একি কাণ্ড! এক নিমেষেই প্রেক্ষাপট বদল। অনীকের সকল বিস্ময় যেন ভর করলো বিপরীত চক্ষুদ্বয়ে।

হাসি থামলো। একেবারে বিলীন হলনা, ঠোঁটে সিই ঝলকের কিছু অংশ রয়েই গেল। অনীক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো, "আমার ভাগ্য, আর তুমি এই ভাগ্যের নিয়ন্তা– মেরী, তুমি আমাকে ধন্য করলে"

মেরী স্মিত হেসে বলে, "এটা আমার জেলা, তুমি এখানে আমার মেহমান– ধন্য করার দায়ভার আমার, তোমার নয়।"

অনীকের মুখে কে যেন বিষ ঢেলে দিল। হঠাৎ হাসিমাখা মুখটা লজ্জায় কেমন যেন চুপসে গেল।

"হ্যাঁ--- মেরী, আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম। এখানে এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করা উচিৎ ছিল।"

"উচিৎ বলছ কেন? বল যে, ইচ্ছা ছিল, কাজের ভিড়ে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি; আর সেক্ষেত্রে সেটা দোষের কিছু নয়। তাছাড়া দেখা করার ক্ষেত্রে তোমারতো কোন বাধ্যবাধকতা নাই, তাইনা ? আবার তুমি আমার বাড়ীর এ্যাড্রেসও জাননা।" হাসিসিক্ত ঠোঁটে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল সে।

"হ্যাঁ, আজ তোমার বলারই দিন– তারপরও আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত।"

"কিছু অনধিকার চর্চা হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত– Really sorry !"

তার কিছু শব্দ অনীকের কাছে খোঁচা মারার মত ঠেকছে। নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে নম্র কণ্ঠে, শান্ত মেজাজে একটু হেসে বললো, "তুমি কেমন আছো ?"

"অনীক তোমার ঐ বিদ্যার দৌড় কি শেষ হয়ে গেছে ? ঐ যে, কারো মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে সে কেমন আছে। নাকি ইদানিং প্রয়োগ-ট্রয়োগ করছ না ?"

আবারও খোঁচা ! হ্যাঁ, অনীকের আর কোন সন্দেহ নাই এতে। এবারও অনীকের লজ্জা নিবারণ সম্ভব হল না। এখন তার নিজেকে ধরে রাখার একমাত্র সম্বল হল হাসি। এই হাসিকে সাথী করে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করলো– "সেটি কোন বিদ্যা নয়, ছিল একটি সময়; একই সময় সবসময় বয়ে চলেনা।" মেরী এক সেকেন্ড দেরী না করে ভ্রু কুঁচকে এক চিলতে হাসি টেনে বলে, "ঐটি বিদ্যাই হোক আর সময়ই হোক কিংবা দুটোর একটিও না হয়ে অন্য কিছু হোক, আমি কিন্তু এখন তা করতে পারি।"

অনীকের হাসি কিছুটা ম্লান হল। কিছুটা অবাক দৃষ্টিতে চাইলো মেরীর দিকে।

"কী বিশ্বাস হচ্ছেনা ? বলব, তুমি কেমন আছ ?"

অনীক ভাবছে, মেরী তাকে আঘাত করছে কেন? কী করেছে সে ?

"আচ্ছা, তাহলে বলেই ফেলি– তুমি বউ নিয়ে খুব সুখেই আছ– কী, ঠিক বলিনি ?"

অনীক কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে আছে তার দিকে। মেরী হাসছে, কিন্তু তার মনের ভেতর প্রচণ্ডবেগে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভাবছে, যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে সে এখন এ অবস্থায় নিজেকে আড়াল করবে কীভাবে; অনীক যেন কিছুতেই

বুঝতে না পারে তার মনের কথা, জানতে না পারে তার কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা। অস্থির হয়ে উঠেছে সে। অনীক কোন হিসাব মেলাতে পারছেনা। শেষমেশ স্থির করলো, তার কোথাও কোন ভুল নাই, সে ঠিকই আছে এবং তার অবস্থানও পরিস্কার করা উচিৎ। সে হেসে উঠলো। হাসিভরা মুখে জানতে চাইলো, "তুমি কী করে জানলে আমার বিয়ের কথা ?"

"কী প্রয়োজন ছিল এ সত্যকে জানার ? কী প্রয়োজন ছিল নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করার? ভালইতো ছিলাম– অন্তত সত্য আর মিথ্যার মাঝে খেলা করে পার করতে পারতাম সারাটি জীবন। নিজেই নিজের কাছে কত ছোট হয়ে গেলাম। ছিঃ ! এত নিচ আমি!" মুহূর্তের মধ্যে এ সকল ভাবনা মেরীকে পাগল করে তুললো। বিয়ে শব্দটি শোনার পর থেকেই অনীকের চোখের দিকে আর চোখ রাখতে পারছে না সে। চোখের পাতা আগের তুলনায় একটু বেশী নড়াচড়া করছে। মুখটি কেমন যেন মলিন দেখাচ্ছে, ঝড়ের ধাক্কায় মনের দেয়াল হচ্ছে চৌচির, নিজেকে খুব অসহায় লাগছে। খুব বোকা মনে হচ্ছে, খুন করতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। ওদিকে অশ্রুকনাগুলো এসে ভিড় জমিয়েছে চোখের প্রচীরের ওপারে– প্রচণ্ড ক্ষোভ ওদের; যেকোন মুহূর্তে প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকার উপক্রম। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না সে। এরই মাঝে অনীক যে কিছুই আঁচ করতে পারেনি তা নয়, কিন্তু এ বিষয়ে যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, এ ভয়ে আর লজ্জায় সে দ্রুত একটি কাগজে তার বাড়ীর ঠিকানা লিখে অনীকের হাতে দিয়ে বললো, "উঠছি-------। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আমাদের বাড়ী এস। আব্বা-আম্মা তোমার কথা প্রায়ই বলেন।"– বলেই সে বেড়িয়ে এল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা হলনা– শেষ বাক্য উচ্চারণকালে চোখের জমিনে ফুটে উঠলো লক্ষ কোটি তারার ন্যায় জলবিন্দু, আর সে জলে গলদেশ ভিজে বাক্য হল ভারাক্রান্ত– এই বিশ্বাসঘাতকতার শেষ ছোবল এসে পড়লো বুঝি বাইরে– অপ্রতিরোধ্য চোখের জল শাড়ীর আঁচলে ঢেকে সে দ্রুত ত্যাগ করল অফিস চত্বর।

অনীক আর কোন কথা না বলে মনোযোগের সাথে দেখলো এ দৃশ্য। ভাবছে, "কোথায় সমস্যা ? কী সমস্যা ? কেন এমন করলো সে? তার আচরণ দেখে মনে হল, আমিই দোষ করেছি। কিন্তু কী দোষ আমার ?" কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছে তাকে। মনে করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু না, তেমন কিছুই পড়ছে না মনে। ওদিকে পড়ে আছে গাদা-গাদা কাজ। তাই সে আর ভাবতে চায়না। "মেয়েটির জিদ একটু বেশীই, হয়ত তার

দৃষ্টিতে কোন কিছু অন্যরকম হয়ে ধরা পড়েছে। একদিন বাড়ীতে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করা যাবে"--- এ ভাবনাকে মাথায় রেখে আবারও কাজে মন দিল সে।

২

সকালে হালকা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির বড় প্রয়োজন ছিল। মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, সবখানেই হাহাকার লেগেছিল। পানির জন্য হাহাকার। চারদিক শুকিয়ে কেমন কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু আশানুরূপ বৃষ্টি হয়নি। প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন। কালো মেঘ করে গগণ ফাটিয়ে অনবরত তিন-চার ঘন্টা বৃষ্টি ঝরবে, এটাই মানুষের প্রত্যাশা। তবুও সকালের ঐ এক ঝলক বৃষ্টি কিছুটা হলেও শান্ত করেছে প্রকৃতি, একই সাথে যেমন স্বস্তি এনেছে জনমনে তেমনি আশাও জাগিয়েছে বুকে। বড় বড় হা করে থাকা মাঠ-ঘাটের গলা অন্তত ভিজেছে– অনেকটা যুদ্ধের ময়দানে অবচেতন হয়ে পড়ে থাকা ক্ষত-বিক্ষত সৈনিকের পানির জন্য দীর্ঘক্ষণ আর্তনাদকালে তার মুখের উপর কোন এক ভেজা বস্ত্রখণ্ড থেকে পড়ন্ত ঐ পানি পানের মত।

চৈত্র মাসে প্রকৃতি বোধ হয় বড়ই নির্মম হয়ে উঠে। এ সময় বোধ হয় তার মানুষের ওপর জমে থাকা সারা বছরের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ সময়টাতে তাপমাত্রা এত বেশী থাকে যে, বহমান বাতাসের মাঝে একটুখানি শীতল পরশ না থাকলে বোঝার কোন উপায়ই নাই যে, একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে।

আজ অনীকের অফিসে কাজের তেমন কোন ঝামেলা নাই। মোটামুটি কর্মমুক্তই বলা যেতে পারে। কখনো সে নিজ কক্ষ ছেড়ে সহকর্মীদের কক্ষে গিয়ে আলাপচারিতায় মেতে উঠছে, কখনো নিজ কক্ষে কাউকে কাউকে ডেকে নিয়ে খোশ গল্প করছে, ইচ্ছে হলেই অফিসের বাইরে এসে রাস্তার মোড়ের ষ্টলটিতে চা খাচ্ছে, সিগারেট টানছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এর ওর সঙ্গে কথা বলছে– এভাবেই পার হল সেই সকাল নয়টা থেকে সাড়ে বারটা, দীর্ঘ তিন ঘন্টা ত্রিশ মিনিট। আর আধাঘন্টা পরেই সে দুপুরের খাবার খেতে যাবে। আজ সে বাসায় খাবে স্ত্রীর সঙ্গে। কাজের চাপ থাকায় প্রায় দিনই তাকে অফিসেই লাঞ্চ সারতে হয়। প্রায় বিশদিন পর আজ সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে খাবে। সকালে নিজ হাতে বাজার করেছে। খুব স্ফূর্তিতে আছে সে এখন। একটু আগেই কথা বলেছে স্ত্রীর সঙ্গে, কিন্তু তাতে কী ? আবারও বলবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের

ওপর পা তুলে স্ত্রীর নাম্বার টিপছে মোবাইলে। কিন্তু পুরো নাম্বার টিপা হলনা। স্যার------ স্যার------ বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে পড়লো অফিস সহকারী, আর তার দিকে নজর দিবার কারণে থেমে থাকলো মোবাইলের কাজটি।

"কী বখতিয়ার সাহেব, কোন সমস্যা ? তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, আজ আপনাদের সব সমস্যার সমাধান করবো। তারপর করব আমার কাজ।"

"স্যার, আমার কোন সমস্যা নাই, আপনার একটা চিঠি আছে। একটা ছেলে এসেছিল– আপনাকে দিতে বলেছে।"

"দ্যান।"

"আমি আসি, স্যার !"

"ধন্যবাদ। আসুন।"

খোলা চিঠি। শুধু স্ট্যাপলারের একটা পিন বসানো গায়ে। সে চিঠিটা উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখছে আর ভাবছে কার চিঠি ?" অফিসিয়াল চিঠিতো অবশ্যই নয়। বাড়ী থেকেও কারো লিখার কথা না। বন্ধু-বান্ধব------ না ? প্রশ্নই আসেনা ! এই মোবাইলের যুগে কার চিঠি লিখার সাধ জাগে ? একটু হেসে পিনটি খুলতে খুলতে উচ্চারণ করলো– উদ্ভট !

অনীক

আমায় ক্ষমা কর। সেদিন অফিসে আমার আচরণ শোভনীয় ছিলনা। তোমার প্রথম হাসিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তুমি আমার নও, তবুও আমার অধিকারের সিংহাসন থেকে আমি নামতে চাইছিলামনা; অবশেষে আমার সন্দেহ প্রমাণিত হল, আমাকে তুমি সিংহাসনচ্যুত করলে। তোমার কোন দোষ নাই, সব দোষ আমার; কিন্তু এছাড়া আমি যে আর অন্যকিছু করতে পারিনি– সেই দিনের তোমার সেই আশ্বাসকে আমি বিশ্বাস করেছি অবিশ্বাস্যভাবে, ভালবেসেছি জীবন দিয়ে। জানো, তোমার পথের দিকে চেয়ে এই আটটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি– প্রতীক্ষার কী যে কষ্ট ! কী যে যন্ত্রণা ! তবুও একটিবারও মনে হয়নি, তুমি আসবেনা। যখন জানতে পারলাম, তুমি এখানে চাকরী নিয়ে এসেছো, বিশ্বাস কর, একমুহূর্ত আর সহ্য হচ্ছিল না– নিমেষেই ভুলে গেলাম আটটি বছরের ক্লেশ, তোমার আশ্বাসকে অপমানিত করে ছুটে গেলাম তোমার কাছে।

অনীক, তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নাই, নাই কোন রাগ; তুমি মাঝে-মধ্যেই বলতে, আমি খুব বোকা, তা আবার প্রমাণিত হল– অনীক, আমি সত্যিই বোকা।

–মেরী

"আশ্বাস! কী সেই আশ্বাস ?"– ভাবতে লাগলো অনীক।

আবারও আসলো মিসড্‌কল। একটায় বাসায় ফেরার কথা। এখান থেকে বাসা মিনিট পাঁচেকের পথ। এখন বাজে একটা দশ। স্ত্রী প্রিয়তমা সমস্ত খাবার টেবিলে সাজিয়ে হাসিমুখে বসে আছে স্বামীর পথপানে– এই বুঝি সে এল! আজ সে নতুন শাড়ী পড়েছে। চুলে শ্যাম্পু করেছে। হাতে পড়েছে নতুন দুই জোড়া বালা। হাত একটু নড়ে উঠলেই একে অপরের স্পর্শে ঝনঝন করে বেজে উঠছে। মনে একটা পরিকল্পনাও আছে– স্বামী ফেরা মাত্রই তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ছোট্ট একটা চুমু দিবে। এই আনন্দে কিছুটা অস্থিরও সে, ভেতরে কেমন যেন একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অনীক। নিমেষেই চোখ-মুখ কেমন শুকিয়ে উঠলো। বর্ণও হল কিছুটা বিবর্ণ। ঘরের মধ্যেই হাঁটাহাঁটি করছে। কিছুটা ছটফটানি ভাব। চুলগুলোর মাঝে আঙুল চালাচ্ছে বারবার। আবার বসলো চেয়ারে। হ্যাঁ, তার মনে পড়েছে সেই আশ্বাসের কথা যার ওপর ভর করে মেরী পার করেছে আটটি বছর। মোবাইল বেজে উঠল স্ত্রীর কল। কেটে দিল। শুধু কেটেই ক্ষান্ত হলনা, বন্ধ করলো মোবাইল।

আজকের মত এক পশলা বৃষ্টিতে ভেজা জ্যৈষ্ঠের চমৎকার এক সকাল। কেটে গেছে সমস্ত মেঘ। পরিস্কার আকাশের গায়ে তেজদীপ্ত সূর্য ধীরে ধীরে মেলে ধরছে তার শক্তিময় প্রতিভা। থেকে থেকে হঠাৎ কোথা থেকে যেন তেড়ে আসছে বাতাসের ঝাপটা– নড়ে উঠছে গাছের সবুজ চিরল পাতা, শালিকের দু' একটা নরম পালক মুক্ত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আপনমনে, ষোড়শীদের সামনের দিকে ঝুলিয়ে রাখা একগুচ্ছ চুল অবাধ্য হচ্ছে বারবার। গাছে গাছে বসেছে আমের মেলা– পাকা আম, কাঁচা আম, আধা-পাকা আম; নানান ধরনের আমের নানান গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে প্রকৃতি।

এমনি মুহূর্তে চলে যাবার সময় হল অনীকের। দেখতে দেখতে কেটে গেল তার এই শহরে পাঁচটি বছর। নওগাঁ শহর। তার নিজ জেলা। আপন বলেই হয়ত কষ্টটা

বেশী। গেল রাতে তার ঘুম আসেনি বললেই চলে। সকাল থেকে মনটা বেশী খারাপ। সময় ফুরাচ্ছে, বাড়ছে কষ্টের জ্বালা। সময় ফুরাতে ফুরাতে এসে ঠেকেছে বিদায়লগ্নে, আর যে ফুরাবার জো নাই। যে ঘরটি তাকে এতদিন স্নেহ দিয়ে মায়া দিয়ে আগলে রেখেছে নিজ সন্তানের মত, সেই ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত দেখছে ঘুরে ঘুরে– হোক অন্যের বাড়ী, হোক অন্যের ঘর– ভাললাগা ভালবাসাতো তার নিজের। এই শহর ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে ঢাকা। ভর্তি হবে ইউনিভার্সিটিতে। এই বিদায়কালে তার পাশে কেউ নাই, সবাইকে সে ছেড়ে এসেছে গতকাল গ্রামে, শুধু একজন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের দরজায়– শান্ত কোমল দৃষ্টি একদম স্থির অনীকের প্রতি; চোখে যেন বৃষ্টি নেমেছে, হয়ত এখনই গড়িয়ে পড়বে ঝরঝর করে।

আনীক এসে দাঁড়ালো সামনে। একেবারে মুখোমুখি।

"মেরী কিছু বলবে ?"

মেরী কোন কথা বলেনা। চেয়ে আছে একইভাবে।

"তুমি হয়ত ভাবছ, আর দেখা হবেনা আমাদের। একদিন এই বাসা ছেড়ে, এই শহর ছেড়ে হয়ত চলে যাবে তোমরা অন্য শহরে, আমিও হয়ত আর খোঁজ করবনা– এসব ভেবে কষ্ট পাচ্ছ, না ?"

এবার জমা হওয়া অশ্রুকনা ফেটে পড়লো উচ্ছ্বাসে। অনীক আঙুলের মাথা দিয়ে চোখের জল মুছে দিতে দিতে বললো, "মেরী, আজকের পর আমাদের প্রথম কথা হবে সাক্ষাতে– আমি সশরীরে এসে দাঁড়াবো তোমার সামনে; সেই দায়ভার আমার, তোমার নয়।"

কিছুটা নড়ে-চড়ে উঠে অনীক। চোখে-মুখে জড়ো হয়েছে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম-বিন্দু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পায়চারী করছে ঘনঘন। চুলে আঙ্গুল চালাচ্ছে। খুব অস্থির দেখাচ্ছে তাকে। একটু থেমে চেয়ারে এসে বসলো।

"কিন্তু আমার আশ্বাসের মাঝেতো প্রেমের কোন ইঙ্গিত ছিলনা– সে কেন এই আশ্বাসের উপর ..... অস্থিরতা কাটছেনা। দু'হাত মাথায় তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। কিছু সময় পর চোখ খুললো। মনে মনে বলে উঠলো, "আমার আশ্বাসের মাঝে প্রেমের ইঙ্গিত ছিলনা সত্য, কিন্তু তার অশ্রুজল?"

"তারিক ? তারিক--- ?"

"স্যার----।"

"ফোনটা রিসিভ করো। আর শোন, আমার বাসার কেউ হলে বলবে, আমি একটা জরুরী মিটিংয়ে আছি; আর অন্য কেউ হলে বলবে, অফিসের কাজে বাইরে আছি।" কথা শেষ করেই সে বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে, তারপর সোজা অফিস চত্বরের বাইরে। সিগারেট ধরালো। উঠে বসলো একটি বেবী ট্যাক্সিতে।

৩

থমথমে বাড়ীর পরিবেশ। পুরো বাড়ী জুড়ে এক ধরনের হাহাকার, এক ধরনের শূন্যতা। অনীক ধীর পায়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে এল দোতলার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াতেই চোখ পড়ল মেরীর বাবা-মার উপর। তাঁরা সিঁড়ি সংলগ্ন ঘরটির মেঝেতে বসে আছেন– অনীক দেখছে, তাঁদের জলময় নির্বিকার দৃষ্টির মাঝে বয়ে চলেছে কষ্টের দরিয়া।

৪

সামনে ধু-ধু চর। জনবসতিহীন। শুধু বালি আর বালি। পড়ন্ত রোদ্র। ঝলসে উঠেছে বালির হৃদয়ে সোনালী বরণ। মৃতপ্রায় স্রোতস্বিনীর ঐ শেষ সম্বলটুকুতে জমে উঠেছে দামাল ছেলেদের কোলাহল। যৌবনকালে নদীর ছোবলে বিধ্বস্ত তীরের কিনারে বিদায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকৃতির বটগাছ। গরু-মহিষের পাল নিয়ে ছুটে আসছে রাখল বালকেরা চরের ওপারের ঘাসের দেশ থেকে। নদীর এক তীরের উপর হতে নীচ পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ছনের থুপ, আর সেগুলোর মাঝে ফুটে আছে নাম না জানা গন্ধহীন বুনো ফুল। নাম না জানা ছোট ছোট পাখিরা ঘর বেঁধেছে ঐ ছনের থুপের মাঝে– ফুড়ুত করে একবার আসছে বাইরে, একবার ঢুকছে ভেতরে। কোথা থেকে নানান বর্ণের নানান আকৃতির পাখি এসে ঘুর-ঘুর করছে নদীর ওপর। গ্রামের একদল কিশোরী কলসী কাঁখে হাস্যজ্জ্বল মুখে আসছে নদীর দিকে। বালির বুক চিরে গরু-মহিষের গাড়ীতে তরমুজ আর বাঙ্গি নিয়ে ঘরে ফিরছে কৃষক।

"কী অদ্ভুত তোমার বর্ণনা! কী অপূর্ব সত্য তুমি! আমাকে নিয়ে এই বটগাছটির নিচে বসে তুমি উপভোগ করতে চেয়েছিল তোমার গ্রামের এই দৃশ্যপট– দেখ, আমি এসেছি------ আমি এসেছি মেরী------,। অনীকের কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছে। চোখের কোণখান থেকে টপ করে এক বিন্দু জল গড়িয়ে পড়লো। সিগারেট ধরালো।

হঠাৎই আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে কিছু মেঘের দল তেড়ে আসছে। কালো মেঘ। স্তূপাকারে দলবেঁধে তারা আক্রমন করছে এদিক সেদিক। একটা দুটা করতে করতে উড়ে আসছে হাজারো স্তূপ। বিদায়ী সূর্য তাদের থাবায় অদৃশ্য হচ্ছে বারবার। বাতাসও উঠেছে একটু জোরেসোরে। বাতাসের টানে ধূলা-বালি কুণ্ডলী পাকিয়ে দ্রুতবেগে উঠে যাচ্ছে উপরে। বটগাছের মরা, অর্ধমরা পাতাগুলো ঝরে পড়ছে তার মাথার উপর। মুহূর্তকালের মধ্যে বদলে গেল প্রেক্ষাপট। যেন আকাশ থেকে জমিনে নেমে এসেছে একটি কালো পর্দা। কে জানে সূর্য কোথায় পালালো! দোর্দণ্ডপ্রতাপে গর্জন করে চলেছে মেঘ। আঁধারের মাঝে চলছে ধূলা-বালির নগ্ন নৃত্য।

কেঁপে উঠলো অনীকের ভেতরটা। সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধেয়ে আসছে কান্নার স্রোত।

"মেরী, যেখানেই থাকো, অক্ষত থাকো– খুঁজতে দাও আমাকে"– ধূলা-বালি আর আঁধারের মাঝে আবছা দেখা গেল তার মুখখানি।

জীবন যখন যেমন

১

ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে মানুষের ঘুম আসে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। তবে এখানে যদি কোন অস্বাভাবিকতা থেকে থাকে তা বোধহয় মানুষের, বৃষ্টির নয়। কিন্তু টিনবিশিষ্ট ছাদের দশহাত বাই আটহাত ঘরে একবারে বাড়ীর আমগাছের তৈরী খাটে শুয়ে মোয়াজ্জেম নামের এই মানুষটির ঘুম আসছে না কেন? এটা কার অস্বাভাবিকতা ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সে উঠে বসলো খাটের ওপর। দুটো বালিশ সাজালো খাটের বাতায়। হেলান দিল সে। মাথাসহ ঘাড় খাড়া, পা-দুটো সোজা বিছানো। সিগারেট ধরালো। ডান পা তুললো বাঁটির ওপর।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। রাতও মোটমুটি ভারীর দিকে। গোটা গ্রাম নীরব, নিস্তব্ধ। যেন সে ছাড়া গ্রামে আর কোন মানুষ নাই। সে এখন কী করবে বুঝতে পারছেনা। সাধারণত মাঝ-রাত পার না হলে সে ঘুমায়না। ছোটকাল থেকেই তার বই পড়ার ব্যাপক নেশা। একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে আবার রেখে দিল। টিনের ওপর বৃষ্টি যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কখনো প্রচণ্ড শব্দ, কখনো একটু ধীরে, আবার কখনো এ দু'য়ের পুরোটাই যেন একটা ছন্দের তালে তালে ঘটছে। একেবারে নির্ভেজাল। যেন প্রকৃতি অপার করুণা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে এ ছন্দ। হঠাৎ তার কবিতা লিখতে ইচ্ছা করলো। ভাবছে, বড় বড় কবিরা এমন রাত্রিতে কবিতা লিখেই বিখ্যাত হয়েছে। তার চেষ্টা করতে দোষ কোথায়? অন্তত একটা কবিতাতে লেখা হবে! কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। হলনা কবিতা। বন্ধুদের ডাকতে ইচ্ছা করছে। তাস পেটাবে। তার ধারণা, এমন রাত্রিতে জগৎজয়ী লোকেরা তাসও খেলেছে। কিন্তু ডাকার উপায় কী? গলা ফাটিয়ে ফেললেও শব্দ বোধ হয় ঘরের দোর-ই পার হবেনা। ঘর থেকে বের হওয়াটাও তার কাছে সুবিধাজনক ঠেকছে না। ভাবছে, "এই প্রায় অপ্রতিরোধ্য বৃষ্টি ঠেলে ডাকতে গিয়ে যদি সারা না মিলে তাহলে অবস্থাটা কী হবে ? তারা তো এই রাতকে নিয়ে এমন নাও ভাবতে পারে। হয়ত বিরক্তই লাগছে তাদের।" তাই কোন উপায় না দেখে শুয়ে পড়ার মনস্থির করলো। কিন্তু চোখে তো ঘুম নেই। ঘুম ছাড়া শুয়ে লাভ কী ? খুব অস্থির লাগছে তার। তারপরও শেষমেশ শুয়েই পড়লো। মশারীও খাটালোনা। ভাবছে,

"ঘুমতো ধরবেইনা! যদি ধরে তখন খাটিয়ে নিব।" কিন্তু রাতটি কোনদিক দিয়ে পার হয়ে গেল সে বুঝতেই পারলনা। সকালে মায়ের কণ্ঠে ঘুম ভাঙলো। ঘুম থেকে উঠে সে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ভাবলো রাতের কথা। চোখে ঘুম না আসা পর্যন্ত বিছানায় যাওয়ার কোন অভ্যাস নাই তার। কিন্তু আজ ঘটলো উল্টো। উল্টোটা যে বৃষ্টিস্নাত রাতেরই দান এটা ভেবে ভেবে সে ধন্যবাদ জানালো বৃষ্টিকে। জানালো প্রকৃতিকে। একবার নয়, দু'বার নয়, কয়েকবার। অবশ্য শরীরের দিকে চেয়ে আরো অবাক হলো। মশা কামড় দিয়ে এত বড় বড় চিত্র এঁকেছে যে, দেখে একটা ঠোঁটচাপা হাসি দিল। আবারও ধন্যবাদ জানালো বৃষ্টিকে– এত নেশা ধরায় সে যে মশার কামড় পর্যন্ত টের পাওয়া যায়না! এবার একটু শব্দ করে হাসতে হাসতে বলে উঠলো, "আসলে বিখ্যাত মানুষরা এমন রাতে এভাবেই ঘুমায়।"

মোয়াজ্জেম হাসতে থাকে। আজ থেকে প্রায় সতের বছর আগের এ ঘটনা। তখন সে ছিল ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। আজ টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ শুনে মনে পড়ে গেল তার অতীত। এখনো মাঝে মাঝে তার গ্রামে গিয়ে এমন রাতে ঘুমাতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন সে ভালবাসে গ্রামকে, ভালবাসেনা গ্রামের মানুষদের। তার দৃষ্টিতে, গ্রামের মানুষগুলো এখন ছল-চাতুরি করে, লোভ-লালসাও বেড়েছে, ছোট-খাট অপরাধ থেকে বড় বড় অপরাধও করছে; গ্রামের সহজ সরল প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস হলেও প্রকৃতির হৃদয় থেকে তারা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তাই সে মনে করে, এখন কোন কবিতা, উপন্যাস কিংবা গল্প লিখতে লেখকদের গ্রামে না যাওয়ায় উত্তম– তাতে কষ্ট বাড়বে, লেখা হবে অস্তিত্বহীন; বরং পূর্বের লেখকরা গ্রাম নিয়ে গ্রামের মানুষ নিয়ে যা বলেছে, যা লিখেছে সেই ধারনা থেকে লিখলেই লেখাটা যথার্থ হবে, অন্যদিকে জীবনানন্দ, জসীম উদ্দিনের আত্মাও শান্তি পাবে। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আরো একটি ধরাতে গিয়ে থেমে গেল। যথেষ্ঠ সিগারেট টানে সে। দিন-রাত মিলিয়ে গোটা পঁচিশেকতো হবেই। কিছুদিন আগে বুকের এক ব্যথায় ডাক্তার ধূমপান করতে নিষেধ করেছেন। এতে খুব একটা উপকার না হলেও পরপর সিগারেট ধরানোর অভ্যাসটা কমেছে। আবারও একই চিন্তা মাথায় ভর করলো– ঘুম আসছে না কেন ? এতক্ষণ শুধু ছিল বৃষ্টি, হঠাৎ ঝড় এসে যোগ দিল। দু'জন মিলে মোটামুটি একটা তাণ্ডবই শুরু করেছে। টিনের চাল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম! মহাবিশ্বের সমস্ত বৃষ্টি যেন এসে হামলা

করেছে তার টিনের চালে।ওদিকে ঝর কি থেমে আছে ? সে চাইছে চালটা উড়িয়ে নিতে। মোটামুটি একটা দ্বন্দ্বই শুরু হয়েছে ঝর আর বৃষ্টির মাঝে। এতক্ষণ ঘুম না আসার কোন কারণ সে উদ্ধার করতে পারছেনা। কোথায় তার সমস্যা ? জীবনের অবস্থান আগা-গোড়া একবার মিলেয়ে নিল– বাবা-মার একমাত্র ছেলে, প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরীজীবি; সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের সাথে উঠা-বসা আবার মন চাইলে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ততে নামতেও কোন বাধা নেই; আর্থিক স্বচ্ছলতা যথেষ্ট, গ্রামের বাড়ীতে বসবাসরত বাবা-মার টাকা পয়সার সমস্যা মৃত্যু পর্যন্ত হবেনা, নাই তেমন কোন রোগবালাইও; বড় বোনের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের ঘরে, জামাইও বড় চাকুরীজীবি এবং ভদ্র, সুখের স্রোতে ভাসতে ভাসতে তার তিন মাসের এপারে বাবা-মা'র কথা মনেই আসেনা– এতকিছু হিসেব করার পর সে বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবে, কোন সমস্যাই নাইতো তার জীবনে! সে ইচ্ছে করেই ছাত্রদের একটা মেসে থাকে। ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করতে, আড্ডা মারতে তার খুব ভাল লাগে। ছাত্রজীবন তার কাছে শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে বিবেচিত। সে বার বার ফিরে যেতে চায় সেই জীবনে। কিন্তু তা অসম্ভব সে জানে, আর তাই ছাত্রদের এই জীবনকে, এই সয়কে সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে, প্রচণ্ড ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাই ছাত্রদের সঙ্গে এই টিনশেডের মেসে তার বসবাস। যেহেতু মানুষ আর পেছনে ফিরতে পারেনা, তাই এ নিয়ে তার মাঝে মধ্যে অনুশোচনা হয়, কিন্তু এটিকে সে সমস্যা হিসেবে দেখেনা। আরও একটি অনুশোচনা আছে তার। তা হল নাম নিয়ে। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন-এর বাবা-মা অতি আদর করে পাঁচটি খাসি কেটে এই নাম রেখেছিলেন। ধর্মের শিকড় জন্মলগ্ন থেকেই হৃদয়ে গাঁথা বলে বাবা-মা হুজুরের পরামর্শেই এই নাম রেখেছেন। এই নাম নিয়ে কখনো কখনো আপত্তি জাগে তার মনে। বন্ধুরা ভার্সিটিতে পড়ার সময় ব্যঙ্গ করে ডাকতো মজ্জেম, এতে তার রাগ হত। গ্রামের লোকজন এখনো তাই বলে ডাকে। অবশ্য এই রাগ বন্ধু বা লোকজনের ওপর হয়না, হয় বাবা-মার উপর। মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠে, "ইসলামী ভাল নাম আর ছিলনা ? আর হুজুরেরইবা কেমন আক্কেল ? একটা সুন্দর নাম দিতে না পারলে সে কীসের হুজুর ?" তবে এখন বড় অবস্থানের কারণে শিক্ষিত মহলে নামটি শ্রদ্ধার সাথে পুরোপুরি উচ্চারিত হয় বলে অনুশোচনার ভিত্তিটা অনেকটাই দুর্বল হয়ে এসেছে। এটিকেও সে কোন সমস্যা মনে করেনা। শেষপর্যন্ত সে কোন কারণই

খুঁজে পেলনা। কিন্তু সে একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে চায়। আরো কিছুক্ষণ গবেষণার পর সে খুজে পেল ফলাফল– তার কোন সমস্যা নাই, এটাই তার সমস্যা; সমস্যাহীন জীবনই সমস্যা।

রাত মাঝপথ পেরিয়ে গড়িয়েছে কিছুদূর। প্রায় একটার কাঁটা ধরধর। ঝর থেমে গেছে। বৃষ্টিও প্রায় থেমে গেছে। মোয়াজ্জেম সিগারেট ধরাবে। দিয়াশলাইয়ের কাঠি শেষ। আরো একটা দিয়াশলাই স্টকে আছে তার। শো-কেচের ড্রয়ার থেকে বের করলো নতুন দিয়াশলাই। সিগারেট ধরাতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। গোটা ঘর অন্ধকার। রাস্তার লাইনও বন্ধ। ওদিকে চাঁদ নাই আকাশের গায়ে। এত অন্ধকার যে সিগারেটের লাল গোলাকার অগ্নি-পিণ্ডটি আড়াল করলে তার শরীর সে দেখতে পাচ্ছেনা। ঘরে মোম আছে। কিন্তু জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। অন্ধকারও তার কাছে আলোর মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে সময়ে সময়ে। অন্ধকারের সঙ্গী হতে চায় সে। সে ভাবে, "যাদের পুরো জীবনটাই অন্ধকারে ঢাকা তাদের কী অবস্থা ? আর এ তো রাতের অন্ধকার! কয়েক ঘন্টা পার হলেই আলো।" ঘনঘন টানছে সিগারেট। মানুষের জীবন কেন বিচিত্র হয়, এ বিষয় নিয়ে তার ভাবনার শেষ নাই। মানুষ কেন ছোট বড় হবে ? আবার ভাবে, "মানুষ কি আসলেই ছোট-বড় ? না-কি মানুষই মানুষকে তা বানিয়ে রেখেছে ?" পরক্ষণেই গা-ঝারা দিয়ে বলে উঠে, "এগুলো ভাবার কোন বিষয় হল ? সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ এগুলো ভাবছে, গবেষণা করছে– কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? মানুষে মানুষে কি ভেদাভেদ কমেছে ?" সিগারেট ফেলে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। এখন তার ঘুম খুব প্রয়োজন। সকালেই অফিস। সারাদিন কাজ। সে এ ধরনের ঘুম মোটেও পছন্দ করেনা। জোর করে ঘুমকে ডেকে আনতে সে মোটেও অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তারপরও কী আর করার ? ঘুমাতে যে তাকে হবেই। তাছাড়া সারাদিন কাজ করবে কী করে। চোখ বন্ধ করলো সে। হাতদুটি কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে বুকের ওপর রাখলো। সে এখন একদম ভাবনামুক্ত। তবুও আসছেনা ঘুম। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো। যেন জীবন্ত লাশ।

২

ঠিক লাঞ্চ আওয়ারে এসেছে মুহিত। চৌধুরী মুহিত কামরান। মোয়াজ্জেমের ভার্সিটি বেলার বন্ধু। শুধু বন্ধু বললে খানিকটা অন্যায় হবে। একেবারে আত্মার মধ্যে বসবাস যার– অভিন্ন সত্ত্বা। একটি বে-সরকারী ব্যাংকে কর্মরত। অভিন্ন হওয়ার ফলেই বুঝি

বিধাতা তাদের ভিন্ন করেননি– একই শহরে পাশাপাশি তাদের অফিস, ইচ্ছে করলেই সশরীরে সাক্ষাৎ ঘটে। পাশাপাশি অবস্থান হলেও দুপুরের খাবারের সময়টা পাশাপাশি হয়না। মুহিতকে বাসায় ফিরতে হয়। কাছাকাছি বাসা। সেখানেও যে আরেকজন হৃদয় খুলে বসে থাকে। তার আত্মার মধ্যেও যে মুহিতের বাস– সেখানে আছে প্রেম, আছে আদর, আছে অধিকার, আছে সুখের এলোমেলো উল্লাস। মুহিতের ভাষায়, "বন্ধু বন্ধুই, বউ কখনো বন্ধু, আরার কখনো প্রেমিকা– তাই ক্ষেত্রবিশেষে তুলনামূলক বিচারে বউয়ের অগ্রাধিকারটা বোধ হয় মানানসই।"

মুহিতের বিয়ের বয়স অল্পদিনের। ছয় মাসের বেশী হবেনা। দুই বন্ধুর ভর্সিটি জীবনের একটা অলিখিত প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তারা কেউ কোনদিন বিয়ে করবেনা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল। মুহিত ভাঙলো। মোয়াজ্জেম তাতে বাধাও দেয়নি আবার সমর্থনও করেনি। মোয়াজ্জেম এখন এ ব্যাপারে আরো বেশী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তখন সে বলেছিল এমনি-এমনি, দেখে-দেখে, ভাবাভাবির বিষয়টা তেমন গুরুত্ব পায়নি। তার ডিপার্টমেন্টের পঞ্চাশ বছরের এক ব্যাচেলর স্যারকে দেখে সে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর এখন সে বাস্তবতার নিরিখে জীবনের প্রয়োজনে বিয়ে না করার সেই পূর্বের সিদ্ধান্তে পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে মনে করে, বিয়ে মানেই নারীর ছোঁয়া, আর নারীর ছোঁয়া মানেই এলোমেলো।

মুহিতকে এ সময় পেয়ে মোয়াজ্জেম খুব খুশী। প্রায় মাস তিনেক পর তারা একসঙ্গে দুপুরে খাবে।

"বন্ধুবর, প্রিয়তমার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি মিললো কী করে ?" মোয়াজ্জেমের প্রশ্ন।

"যদি সে সত্যিই প্রিয়তমা হয়, তাহলে সে বাঁধতেও পারে, ছাড়তেও জানে।" মুহিত মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতে হাসতে বললো।

"শুনেছি, নারীর স্পর্শে নাকি সাহিত্য যৌবন পায়, এখন দেখছি, তোর মুখও যৌবন-দীপ্ত হয়ে উঠেছে– এমন সুন্দর কথাতো তোর মুখ থেকে আগে কখনো বেরুয়নি!"

মুহিত মোয়াজ্জেমের পিঠ চাপড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে, "যাতে তোর মুখটাই একটা সাহিত্য হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাই পাকা করতে এসেছি। দোস্ত, এই মেয়েকে যদি

তুই একবার দেখিস, মেয়েদের সম্পর্কে তোর ধারনার পঞ্চাশভাগ নিশ্চিহ্ন হবে, আর কথা বললে বাকী পঞ্চাশভাগ পালাবার রাস্তা পাবেনা।"

"মুহিত, আমি বিয়ে করবনা তা তুই ভাল করেই জানিস, অযথা এ বিষয়ে কেন কথা বলিস ?"

"কেন তুই বিয়ে করবিনা ? কোন যুক্তিতে ? চাকরী পেয়েছিস সাত বছর আগে। এখন তোর বয়স পঁয়ত্রিশ। আর্থিক সমর্থ্যে কোন কমতি নাই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তোর বিয়ে করা ফরজ। অন্যদিকে তোর বাবা-মা'র কি সখ হয়না ছেলের বউ দেখার ? নাতি-নাতনি দেখার ? ঠিক আছে, এসব না হয় বাদ দিলাম– পুরুষত্ব বলেও তো একটা কথা আছে না কি ? নারীর সঙ্গ ছাড়া একজন পুরুষ চলবে কী করে ?"

"ব্যাপারটা এরকম কিছু নয়। বিয়েতে আমার কোন সমস্যা নাই, নাই নারীর সঙ্গতেও– সমস্যা হচ্ছে বিবাহোত্তর জীবনে আমার কর্তব্যবোধের। একটা নারীকে সবসময় প্রটেকশন দিয়ে রাখতে হবে, তার চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে হবে, আমার চলা-ফেরা, উঠা-বসা সবকিছুতে থাকবে তার ছায়া-এর চেয়ে দেখ, একা জীবন! যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকি, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাই, যখন ইচ্ছা তখন ফিরি, আনন্দ করি, উল্লাস করি, কেউ কিছু জিঙ্গাসা করেনা, কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হয়না, নাই কোন চিন্তা, নাই কোন ঝামেলা। আর ঐ পুরুষত্ব নিয়ে কী যেন বলছিলি ? হ্যাঁ, সে সম্পর্কে আমি ভাল জ্ঞাত, কিন্তু তাকে দমন করার কর্তব্যতো মানুষেরই, অন্য কোন প্রাণীর নয়।"

"তাই বলে তুই ইচ্ছা করে দমন করবি ?"

"চলছিতো, না কি ?"

"দেখ, নারীকে জানা, দেখা, তার সঙ্গে কথা বলা এক জিনিস, আর তার স্পর্শ অন্য কিছু, সম্পূর্ণ ভিন্ন; পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বকের চেয়েও এই স্পর্শ শক্তিশালী চুম্বক ধরে শক্তি দিয়ে, নারী ধরে প্রেম দিয়ে; চুম্বক করে রাখে বন্দী, নারী দেয় মুক্তি। এই শক্তির স্বাদ একবার পেলে ঘরই হবে তোর পৃথিবী, কোথায় আর যাবি ?"

"আর লেকচার দেয়ার প্রয়োজন নাই, থাম এবার দয়া করে। খাবার চলে এসেছে। হাত-মুখ ধুয়ে নে। আর একটা কাজ করতে পারিস– নারীর সঙ্গ, স্পর্শ– এগুলোর উপর একটা বই লিখে ফেল, বাজারজাত করার দায়িত্ব আমার।"

মুহিত আর কোন কথা বললো না। মাথা নিচু করে দু-তিনবার ডানে-বামে ঝুঁকিয়ে খাওয়ার প্রস্তুতি নিল।

বিকাল পাঁচটা। অফিস থেকে বেরিয়ে মোয়াজ্জেম সোজা চলে এসেছে নদীর পাড়ে। শহরের গা ঘেঁষে নদীটি বয়ে গেছে। সে প্রায়ই এমনটি করে। অফিস থেকে মাত্র তিন মিনিটের পথ পার হলেই মেস। কিন্তু এ সময়টাতে মেসে ফেরাটা তার কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। এসময় পোশাক পরিবর্তনও তার কাছে ঝামেলার ব্যাপার। সাধারণত যে জায়গাটিতে সে বসে তা আজ মিলেনি। একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা দখল করেছে। ভিন্ন এক জায়গা বেছে নিল। ঘাসযুক্ত জায়গা। জুতা খুলে ফেললো। শার্টের সর্ব উপরের দুটি বোতাম খুলে দিল। মাথার চুলে কয়েকবার আঙুল চালালো। সিগারেট ধরালো। নদীর দিকে তাকিয়ে সিগারেটটি শেষ করবে ভেবেছিল। নদীর হৃদয় নাকি বিশাল, সেখানে তাকিয়ে থাকলে নাকি দুঃখ-যাতনা দূর হয়। কিন্তু তারতো কোন দুঃখ নাই। তারপরও সে তাকিয়ে তাকিয়েই টানবে ভেবেছিল, অন্তত কারো ফেলে যাওয়া কোন কষ্ট যদি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু এই জোড়াটিকে দেখেই তার মনে পড়ে গেল মুহিতের কথাগুলো। সবগুলো শব্দ তার চোখের সামনে ভাসছে। নদীর হৃদয়ে আর চোখ স্থির হল না। একটু অস্থির হয়ে উঠেছে সে। সিগারেট ফুঁকছে, নদীর দিকে চাইছে, আবার ওদের দিকেও। কোথাও চোখ স্থির হচ্ছেনা। মুহিতের শব্দগুলো মুহূর্তের মধ্যে দখল করে ফেলেছে তার পুরো মাথা। বার বার এই শব্দদ্বয় ধাক্কা দিচ্ছে মনে– 'স্পর্শ'– 'মুক্তি'। সে ভাবছে, "কী আর এমন শক্তি এটি যে পুরুষকে ঘরে বন্দী করে রাখতে পারে!" স্পর্শ থেকে মুক্তি পর্যন্ত গোটা পথই সে অনুধাবন করতে পারছে, কিন্তু কাটছেনা সংশয়। সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ভাবছে, "বিয়ে না করে কি ভুলই করছি ? বিয়ের পূর্বের চিন্তা-ভাবনা বুঝি এমন হয়। বিয়ের পর মনে হয় জীবন স্থির হয়।" আবার ভাবছে, "যদি হয় উল্টো, তাহলে কী হবে ? ডিভোর্স! এটা কী করে সম্ভব ? মানুষ কী বলবে ? সমাজ কী বলবে ? আমিই বা দশজনের সামনে যাব কী করে ? আবার ওভাবেতো সংসার ধরে রাখাও যাবেনা।" সে এবার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি ফিরালো নদীর দিকে। গভীরভাবে চিন্তা করছে, কী সিদ্ধান্ত নিবে সে। কিছু সময় পর সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে, "এগুলো মুহিতের আজগুবি কথাবার্তা! আমাকে কিভাবে বিয়ে করাবে এই ধান্দা। ধুর----! কী ভাবলাম এতক্ষণ পাগলের মত!" একটু হেসে নিল। ডানে-বাঁয়ে একবার তাকালো। এবার চাইলো আকাশের দিকে। চোখ

নামিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সিগারেট বের করলো। ঠোঁটে সিগারেট চেপে কয়েক বার গালি দিয়ে নিল মুহিতকে– "শালা আহাম্মক! আমার সঙ্গে পাকনামি কর! শালা-------!" সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটি ডান দিকে ছুড়ে মারতেই চোখ পড়লো জোড়াটির ওপর। চোখ স্থিরও হল। দু'জনার ঠোঁট দু'জনার ঠোঁটে আড়ষ্ট। কয়েক সেকেন্ড! ঠোঁট সরে গেল। সে দৃষ্টি ফিরালো। এ সময়টুকু সিগারেটটি ঠোঁটেই ছিল। ঘনঘন টানছে। মনে হয় কোন প্রতিযোগিতায় নেমেছে সে– যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। মাথা নিচু করলো। বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে চুল টানছে। মুহিতের যে শব্দগুলোকে সে কিছুক্ষণ আগে পরিত্যাগ করেছে সেগুলোর একটি আবার ঢুকে পড়লো মনের ভেতর– 'মুক্তি'। ভাবছে, "ছেলে-মেয়ে দুটি কি মুক্তির পথ খুঁজছে ? মুক্তির জন্য এরা এত লালায়িত কেন ? কী আছে তাতে ?" হালকা হওয়ার চেষ্টা করছে সে এ ভাবনা থেকে। পূর্বের মত ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছেনা তাতে। শব্দটি জোরে-সোরে চেপে ধরেছে তাকে। তার অস্থির লাগছে। "মানুষ হিসেবে এই মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করা উচিৎ, এটিও তো এক প্রকার অধিকার; তারপরও এ বিষয়টিকেতো এতদিন দমন করেই আসছিলাম, কিন্তু আজ এমন লাগছে কেন ? এটি এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে কেন ?"– এসব ভাবতে ভাবতে সে আবারও দৃষ্টি ফেরায় মেয়েটির দিকে। মেয়েটি বয়সে তার অনেক ছোট। অন্তত তের-চৌদ্দ বছরের। কিন্তু তাতে কী ? সে অমন কিছুই ভাবছে না। অসম্ভব আকর্ষণীয় লাগছে মেয়েটিকে তার কাছে। ক্ষণে ক্ষণেই যেন মেয়েটি আকষণীয় হয়ে উঠছে। সে মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখছে। অস্থিরতা বেড়েই চলেছে তার। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। অবাক হয়ে ভাবছে, "এত সুন্দর চেহারার একটি মেয়ে, অথচ তার মুখের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই! তার শরীর দেখতে ভাল লাগছে। এক ধরনের লোভ কাজ করছে। এমন হচ্ছে কেন ? আমি কি আমার পুরুষত্বের নিকট পরাজিত হচ্ছি!" সে চোখ বন্ধ করে দুই হাতে দুই পাশ থেকে মাথার চুলগুলো ধরে মাথা নিচু করে রইলো। কিন্তু অস্থিরতা তাকে ক্ষমা করছেনা। মুহূর্তের মধ্যে লোমগুলো কেমন কাঁটা-কাঁটা হয়ে উঠেছে। শরীরে কেমন যেন একটা কম্পন অনুভূত হচ্ছে। সে ঠিক করলো, এ স্থান সে ত্যাগ করবে। এ পরাজয় সে মেনে নিবেনা। তার পুরুষত্বকে সে দমন করতে চায়। চুল ঠিক-ঠাক করে মাথা তুলতেই চোখ পড়লো একটা মেয়ের উপর। ঠিক তার সামনে। একটা ছোট্ট নৌকা থেকে নামছে। সঙ্গে একজন তরতাজা যুবক। মেয়েটির বয়স বিশ থেকে বাইশের মধ্যে হবে। নৌকাটি সবেমাত্র এসে ভিড়েছে। এক পা তার

নৌকায়, আর এক পা মাটি ছুঁয়েছে। পরনে শাড়ী। নীল রং। যেন আকাশের সব নীল ওখানে জড়ো হয়েছে। গায়ের রং ফরসা, তবে শুধুই ফরসা নয়– এর উপরিভাগে একধরনের লালের ছোঁয়া। এ দু'য়ে মিশে সৃষ্টি করেছে আলাদা এক রং– যেন পড়ন্ত বিকালে আকাশের গায়ে আলতোভাবে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের সঙ্গে সূর্যের লাল রশ্মির মিলনের সেই পর্ব। মেয়েটির বক্ষ থেকে শাড়ীর অংশটুকু নিচে পড়ে গেছে। মোয়াজ্জেমের দৃষ্টি আটকে গেছে সেখানে। একদম স্থির, অটল, নড়াচড়ার কোন সম্ভবনা আছে কিনা তা যিনি এই চোখ সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভাল জানেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে পা রেখে আজ সে ধন্য, মৃত্যুতে আর কোন ভয় নাই। মেয়েটি সামনে দিয়ে চলে গেল। তার দৃষ্টিও ততক্ষণ পর্যন্ত এক নিমেষের জন্যও সরলনা যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা গেল। এবার সে আরো অস্থির হয়ে উঠলো। মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। চোখের সামনে সারাক্ষণ ভেসে উঠছে মেয়েটির বুক। এটি ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। শুধুই ভাবছে, "এত সুন্দর! এত আকর্ষণীয়! তাহলে পুরো দেহটা কত সুন্দর ? কত আকর্ষণীয়" তার মাথায় এখন এছাড়া আর অন্যকিছু নাই। সমস্ত ভাবনা জুড়ে শুধুই এখন মেয়েটির দেহ। সে এখন ভুলে গেছে মুহিতের শব্দগুলো। দেহ ছাড়া অন্য কোনকিছু সে এখন চেনেনা, জানেনা। মেয়েটিকে নগ্ন করেছে সে এই মাত্র। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখছে বারবার। এবার ছোঁয়ার পালা। কিন্তু ছুঁতে গিয়েই হল সর্বনাশ– কল্পনা ভাঙলো, মেয়েটিও পালালো। এবার সে আরো শক্তিশালী হল। দেহে মনে চেতনায় সর্বভাবে। সে এখন দেখবে দেহ। নগ্ন দেহ। যা খুশি তাই করবে তাকে নিয়ে। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে, "কত বোকা আমি! একেবারে গর্দভ! এতবছর ধরে আমি অন্ধকারে বাস করছি!" এখনই তার একটা নারী প্রয়োজন। নারী ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারছেনা। কিন্তু কোথায় পাবে সে নারী ? কিছুতেই মিলছেনা খোঁজ। সে উঠে দাঁড়ালো। সিগারেট ধরালো। মোটামুটি হাত দশেক দৈর্ঘের জায়গার মধ্যে পায়চারি করছে আর ভাবছে। হঠাৎ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ঠোঁটে ঝিলিক মারলো হাসি, আর সেই ঝলক যেন বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলো– yes-----! শিলা------- ! শিলা তার খালাতো বোন। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। মেয়েটি ভালবেসেই একসময় আসত তার কাছে। একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা সে। প্রেম-টেমকে মোয়াজ্জেম কখনই পাত্তা দেয়নি, আজওনা। শিলা কোন উপায় না দেখে শেষে এমন প্রস্তাব দিয়েছিল– মোয়াজ্জেম যা চাইবে তাই সে তাকে দিবে, বিনিময়ে মোয়াজ্জেম শুধু একবার বলবে যে, সে তাকে

ভালবাসে। এটা শুনে সে ধমক দিয়ে শিলাকে তার ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। এইতো মাসতিনেক আগের কথা। তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ রাখেনি।

মোয়াজ্জেম রিং দিল শিলাকে। প্রথম দুইবার মোবাইল রিসিভ করল না সে, তৃতীয়বারে ধরলো।

"শিলা, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী।"

"কোন প্রস্তাব ?" শিলা রেগে জিঙ্গাসা করলো।

"ঐ যে , আমি যা চাই তুমি তা দিবে।"

"কী চাও তুমি ?"

"তোমাকে------।"

"কীভাবে ?"

"আজ তুমি হারিয়ে যাবে আমার মাঝে।"

"কুত্তার বাচ্চা! আর কোন দিন ফোন করবি না ? তোকে আমি চিনিনা ?" বলেই লাইন কেটে দিল।

এবার মোয়াজ্জেম ক্ষিপ্র হয়ে উঠলো। মাথার রগগুলো চিনচিন করছে। যেন সমস্ত রক্ত তার মাথায় এসে জড়ো হয়েছে। শিলার গালমন্দ নারীকে পাওয়ার প্রবণতা আরো বাড়িয়ে দিল। সে এখন পাগলের মত বিড়বিড় করছে। এখন কাকে রিং করবে, কোথায় যাবে, কোথায় পাবে। সে অনেকটা বেসামাল হয়ে পড়েছে। ঠিক এমুহূর্তে মনে পড়লো হোটেলের কথা। এ বিষয়ে তার এক বন্ধু একদিন তাকে সবকিছু বলেছে। মনে মনে হাসছে আর বলছে, "কে ফেরাবে এবার ? কে বাধা দিবে ? নারী তো নারীই! দেহতো দেহই! সেখানে হোটেল আর বাইর-এর পার্থক্য কী ?" সে রাস্তায় আসলো দ্রুত। একটা রিক্সায় উঠলো। ছুটলো হোটেলের দিকে।

বিকাল শেষ বললেই চলে। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। নাম নাজানা অসংখ্য পাখি রাতের আশ্রয়ের খোঁজে ঠাঁই হচ্ছে নদীর পাড়ের গাছগুলোয়। নদীর ওপর আরো বহু অজানা পাখি ঘুরঘুর করছে। নদীপাড়ে মানুষের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। নদীতে এখন ছোট বড় অনেক নৌকা। ছেলেমেয়েরা জোড়ায়-জোড়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে নৌকায় করে। মাঝে দু'একটি মালবোঝাই বড় নৌকা নদীর বুক চিরে দ্রুতবেগে পার হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি-সীমানা। বিদায়-বেলায় সূর্য অকৃত্রিমভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে

দিয়েছে লাল রং। অফিস শেষে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকলে প্রতিদিনই এসবের আকর্ষণে ছুটে আসে মোয়াজ্জেম। সে বলে "এত আকর্ষণীয়, এত সুন্দর দৃশ্য আর কিছু হতে পারেনা– এসব দেখে দেখেই মানুষ কাটিয়ে দিতে পারে বছরের পর বছর।" অথচ আজ এদৃশ্য তাকে ধরে রাখতে পারল না, পারল না কাছে টানতে। যেন মোয়াজ্জেমকে নিয়ে শর্তভিত্তিক একটা যুদ্ধ হয়ে গেল– সুন্দরে-সুন্দরে, আকর্ষণে-আকর্ষণে; যে জয়লাভ করলো, শর্তানুযায়ী সেই পেল মোয়াজ্জেমকে।

৩

মোয়াজ্জেম পা দিয়েছে সাঁইত্রিশে। চুল-দাড়িতে পাকন ধরেছে। চুলে কলপ মাখে। প্রায় প্রতিদিনই শেভ করে। মাঝের দুই বছর চললো তার নারী-গবেষণা। গবেষণায় প্রথম বছরেই নারী জয়ী হয়েছে, পরের বছর সে অনেকটা ইচ্ছা করেই কাটিয়েছে ঐ জগতে। এখন সে বিয়ে করতে চায়। হোটেলে সে পেয়েছে দেহ, পায়নি প্রেম, পায়নি আদর। এখন তার দরকার তিনটিই। সে এখন বিশ্বাস করে, স্ত্রী হিসেবে একজন নারী স্বামীকে ধরে রাখতে সক্ষম। সে আরো বিশ্বাস করে, কেবল স্ত্রী হিসেবেই একজন নারী একজন পুরুষকে তার পূর্ণতা দান করতে পারে; আর যে স্ত্রী প্রেম দেয়, আদর দেয়, তার দায়ভার নিতে তার কখনই কার্পণ্য থাকবে না।

সে মুহিতকে ফোন করে মেয়ে দেখতে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করলো। আগামীকালই সেই দিন। সেই মেয়েটি যার সম্পর্কে মুহিত সাফাই গেয়েছিল।

৪

মেয়ে দেখা সম্পন্ন হল। পছন্দ হয়েছে মোয়াজ্জেমের। যেমন তেমন পছন্দ নয়, একেবারে মনে ধরেছে। পারলে এখনই বিয়ে করে। মুহিত মেয়ের বাবা-মাকে জানিয়েছে বিষয়টি। তারাও রাজি। এদিকে মোয়াজ্জেম বাবা-মাকে ফোন করে দিয়েছে বিয়ের দিন ঠিক করার জন্য। বাবা-মা এতে খুবই খুশী। আনন্দে সঙ্গে-সঙ্গে আধামন মিষ্টি বিলিয়েছে গ্রামবাসীর মাঝে। মোয়াজ্জেম সব বন্ধুদের ফোন করে প্রস্তুতি নিতে বলেছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন মূল্যে সে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখতে চায়। তাদের কাছে পাত্রীর সে কী প্রশংসা! "মেয়েটির নাম লাবণ্য। বয়স পঁচিশ, মাথা থেকে

পা পর্যন্ত তার ছড়িয়ে আছে লাবণ্য। এমন মেয়েকেই সে চেয়েছে। গুণে গুণান্বিত। অপূর্ব! শিক্ষিত। তার হৃদয়ের রানী হয়েই সে থাকবে সারাজীবন"– ফোনে, সাক্ষাতে পরিচিতজনদের এসব বলেই তার সময় কাটছে এখন।

একদিন কেটে গেল। আগামীকালই আসবেন তার বাবা-মা বিয়ের দিন ঠিক করতে। সঙ্গে আসবে তার একমাত্র বোনও। গেল রাতে এক মুহূর্তের জন্যও তার চোখে ঘুম আসেনি। সারাক্ষণ সে ভেবেছে লাবণ্যকে নিয়ে। প্রথম দর্শনেই সে ভালবেসে ফেলেছে তাকে। প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে সেই ভালবাসা। এখন লাবণ্য ছাড়া সে যেন আর কাউকে চেনেনা। কখন সে ঘোমটা দিয়ে আসবে তার ঘরে, মাথা রাখবে তার বুকে– এ ভাবনায় সে এখন মাতাল। সময় যেন কাটতে চায়না। এখন প্রতিটি সেকেন্ড তার কাছে মনে হচ্ছে প্রতিটি ঘন্টার মত। তার ভেতর– বাইর সর্বত্র এখন লাবণ্য আর লাবণ্য।

৫

আর কিছু সময় পরেই নামবে সন্ধ্যা। মোয়াজ্জেম এসেছে নদীর পাড়ে। অনেকদিন পর সে আসলো। যে দৃশ্যের টানে সে ছুটে আসত এখানে সেই দৃশ্য দেখবে বলে এসেছে। আপনা আপনি বলে উঠছে মন– বিয়ের পর সে আর লাবণ্য মিলে এ দৃশ্য উপভোগ করবে। অতীব আনন্দে সে সিগারেট ধরালো। মনে মনে শপথ নিচ্ছে, যদি লাবণ্য সিগারেট পছন্দ না করে সে সিগারেট ছেড়ে দিবে চিরতরে। এমন সময় বেজে উঠলো মোবাইল। মুহিতের কল। এই নাম্বার দেখা মাত্রই তার ভেতরে প্রশান্তির একটা ঝড় বয়ে গেল। যেন সে এ ফোনটির জন্য ব্যাকুল ছিল। মুখভরা হাসি নিয়ে রিসিভ করলো কলটি। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল হাসি। গোটা শরীর যেন হিম হয়ে আসছে তার। হাত-পা কাঁপছে। সমস্ত মুখমন্ডল কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কথা শেষ না হতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, "Stop Muhit ? Stop ? NO more?"– এটুকু বলেই সে লাইন কেটে দিল। সজোরে ছুড়ে মারলো মোবাইলটি নদীর মাঝে। তাকে এখন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। লাবণ্য বিয়ে করবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে এবং এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার যেন তাকে বিরক্ত করা না হয় বলে সতর্ক করে দিয়েছে। এই 'না'-এর কারণও উদ্ধার করেছে মুহিত– মোয়াজ্জেমের বয়স বেশী, এক কথায় জবাব দিয়েছে মেয়েটি।

প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসছে মোয়াজ্জেম। শুধু ক্ষোভই নয়, এর মাঝে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কষ্টের চিহ্ন। সে বসে পড়লো। দৃষ্টি মেললো নদীর হৃদয়ে। এতদিন সে নদীর বুকে খুঁজেছে অন্যের কষ্ট, আজ হয়ত তারই কষ্টে ভরে উঠবে নদীর হৃদয়। আপন বেশে আপন গতিতে চোখের সীমানা ভেদ করে বেরিয়ে পড়লো দু'ফোঁটা জল। সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেললো। প্রতিজ্ঞা করলো– বিয়ে আর করবে না সে, সারাজীবন একা থাকবে। উঠে দাঁড়ালো। জোর পায়ে আসলো রাস্তায়। একটা রিক্সা নিয়ে এল পানঘরে। জীবনে এই প্রথম সে পা রাখলো এখানে।

গ্লাসে রঙিন পানির মাঝে ভেসে উঠেছে কিছু মুখ– জ্বলজ্যান্ত নারীর মুখ। হেসে উঠলো মোয়াজ্জেম। তাড়াতাড়ি ঢুক গিলে বেরিয়ে এল রাস্তায়। উঠে বসলো রিক্সায়। সিগারেট ধরালো। ছুটে চলেছে রিক্সা। ঠিকানা অতি পরিচিত– একদিনের নয়, দুই দিনের নয়, পাকা দুই বছরের।

দহন

১

চোখের ওপর চোখ। কার চোখ ? মাহীর ? না, শুধু মাহীর নয়। দুজনার চোখ। মাহী আর শিলার। স্থির! একদম স্থির ! যেন অনন্তকাল ধরে দেখবে দু'জন দু'জনকে। একই ভাবে দুজোড়া চোখ স্থির হয়েছিল একে অপরের প্রতি। আগের কথা। বছর আটেক হবে। পাবলিক লাইব্রেরী চত্বর। জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরী। সেটি ছিল প্রথম প্রেম। প্রথম ছোঁয়া। দু'জন দু'জনকে কাছে পাওয়ার আপন করে পাওয়ার প্রথম দিন। ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে যেন দু'জনেই হারিয়ে ফেলেছিল হুঁশ। সে কী চাওয়া পরস্পরের প্রতি। সেদিন ছিল প্রখর রোদ্র। দু'জনেই ঘেমে হয়েছিল একাকার। তবুও কোন রাগ ছিলনা রোদ্রের ওপর। আজও সেই দেখা। কিন্তু সেই দেখা ছিল আনন্দের, আজ বিরহের। শিলার চোখে জলরাশির খেলা। মাহীর চোখে নাই কোন অশ্রু; কিন্তু আছে কষ্ট, আছে ক্ষোভ। হঠাৎ মাহী দৃষ্টি সরিয়ে নিল। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, "তোমরা ভেতরে চল।" এখনও পর্যন্ত শিলা দৃষ্টি ফেরায়নি। শিলাসহ তিন বান্ধবী এসেছে বেড়াতে। মাহীর নয়, শিলার বান্ধবী। দু'জনার সঙ্গেই পরিচয় আছে মাহীর। সেই দিন থেকে পরিচয় যে দিন প্রথম কথা হয়েছিল শিলার সঙ্গে। বলতে গেলে এরাই ঘটিয়েছিল প্রেমের সূচনা। এরাই একে অপরকে কাছে আসতে সাহায্য করেছিল। ভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় এরা আসতে চেয়েছিল মাহীর বাড়ী। কয়েকবার পরিকল্পনা নিয়েছিল কিন্তু সময়ের অভাবেই সম্ভব হয়ে উঠেনি। বিশেষ করে শিলার ঝোঁক ছিল ব্যাপক। এই বাড়ীতেই ঘোমটা টেনে আসার স্বপ্ন দেখতো সে।

গত দু'বছর ধরে শিলার সঙ্গে মাহীর কোন কথা হয়নি। হয়নি সাক্ষাৎ। শিলা অসংখ্যবার রিং দিয়েছে মোবাইলে কিন্তু সে একবারও রিসিভ করেনি। বিয়ের পর পরই শিলা চলে গিয়েছিল আমেরিকা স্বামীর সঙ্গে। কয়েকদিন আগে ফিরেছে সে। এখন থেকে দেশেই থাকবে। তার স্বামী সেখানে ব্যবসা-পাতি প্রায় গুটিয়ে নিয়েছে। আর মাস তিনেকের মধ্যে সেও ফিরবে দেশে। এখানেই করবে ব্যবসা।

শিলার বিয়ের পর এই দুই বছর ধরে মাহী তাল-বেতাল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। বিয়ে কোনদিন করবেনা জানিয়ে দিয়েছে বাবা-মাকে। সিগারেটের মাত্রা বেড়েছে।

হাতে উঠেছে মদের গ্লাস। একটাই ছেলে। বাবা-মা ছেলেকে নিয়ে শঙ্কিত, চিন্তিত। প্রথম প্রথম বাড়াবাড়ি করলেও এখন তাঁরা ছেলেকে আর তেমন কিছুই বলেননা। তাদের ভয় এটিই যে, বাড়াবাড়ি করলে সে যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে। এমনিতেই মায়ের অবস্থা খারাপ। ছেলের এ অবস্থা দেখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করেন। তারা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "বাবা তোর যা মনে চায় তাই কর শুধু এই সিগারেট আর মদ ছেড়ে দে। তুই আমাদের আলো, তোর কিছু হলে আমরা বাঁচবনা। তুই সারা জীবন শুয়ে-বসে খা, কোন আপত্তি নাই আমাদের। বিয়ে করতে না চাস, করিসনা। এই এতবড় বাড়ী এত সম্পত্তি-সবই তোর। তুই কেন বিপথে যাবি ? তোর কিসের অভাব ?" বিষয়টি সে এখনো জানায়নি বাবা-মাকে। আগে সে যথেষ্ট শান্ত ছিল, ছিল ভদ্র। এখন সে শুধু অশান্তই নয়, কখনো কখনো তার অভদ্রতার শিকারও হয় দু' একজন।

শিলার বিয়ের পর মাহীর যন্ত্রণার যেমন সীমা নাই তেমনি যন্ত্রণার সঙ্গে জন্ম দিয়েছে ক্ষোভ– দিনে দিনে এই ক্ষোভের মাত্রা বেড়েই চলেছে। সে মেনে নিয়েছে শিলার বিয়ে কিন্তু মেনে নিতে পারেনি সেই সময়ে তার ভূমিকা। বিয়ের জন্য সে শিলাকেই দায়ী করে। শিলা তার কাছে এখন বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়। গত কয়েকদিন আগে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিবে। তার দৃষ্টিতে এটি অনৈতিক অমানবিক– তার জীবন নিয়ে খেলার কোন অধিকার নাই কারো; এটি সে কিছুতেই মেনে নিবেনা। তাই শিলার অপেক্ষায় ছিল সে। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরলেই সে প্রতিশোধ নিবে এমন পরিকল্পনাই মাথায় এঁটেছিল। কিন্তু যেন মেঘ না চাইতেই জল– আজ শিলা নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

২

মাঝরাত পেরিয়েছে ঘড়ির কাঁটা। একটার কাছাকাছি হবে। বাড়ীর সবাই ঘুমে বিভোর। দুই বান্ধবী লতা এবং চন্দনাও ঘুমিয়ে গেছে ঘন্টা তিনেক আগে। শুধু গোটা গ্রামে জেগে আছে প্রকৃতি আর দুটি প্রাণ– মাহী আর শিলা। দোতলা বাড়ী। দোতলারই একটি ঘরে থাকে মাহী। শিলা এসেছে এ ঘরে। জোছনা রাত। ঘরের জানালা দিয়ে অবাধে ঢুকে পড়েছে তার আলো। জানালার ওপারেই দিগন্তজোড়া মাঠ। বর্ষা এসেছে

ক'দিন আগে। নতুন পানিতে ভরে উঠেছে মাঠের হৃদয়। মাঠের সারা শরীর জুড়ে পানির ছলছলানি। জোছনার আলোয় চিকচিক করছে পানির উপরিভাগ। মাঠের মাঝে দু' একটি ঢিবি মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই কোল জুড়ে পানির বসবাস। মাঠের প্রান্তে সারি সারি গাছ। একটির সঙ্গে মিশে গেছে আর একটির মাথা। একেবারে সমান্তরাল– মানে হচ্ছে সবুজ গালিচা বিছানো পথ।

শিলা বসেছে জানালা ঘেঁষে একটি চেয়ারে। মাহী এক হাত দূরে সামনের একটি চেয়ারে।

"কেমন আছ ?" প্রশ্নটির মধ্য দিয়ে শিলাই শুরু করলো কথা।

"যেমন রেখেছ।"

"আমি ভাল নাই।"

"তুমি তো ভাল-মন্দের দেবী! অন্যের ভাল-মন্দ সৃষ্টি করতে পার আর নিজেরটা পারনা এটি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ ?"

শিলা কোন উত্তর করলনা। মাহীর এ কথায় কষ্ট পেয়েছে।

"আমেরিকা থেকে কবে ফিরলে ?"

"এইতো দিন সাতেক হবে।"

"এখানে এসেছ কেন ?"

জবাব না দিয়ে সে তাকিয়ে আছে মাহীর দিকে। চোখের ভেতরভাগ কিছুটা লাল হয়ে উঠেছে। মাহী চোখ রাখতে পারলনা এ চোখে। দৃষ্টি সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,"আমেরিকাতে গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে নাকি পা মচকে গিয়েছিল ?"

"আমার খবর নিয়েছ কেন ?"

"জানতে চাইনি, চন্দনা ফোন করে জানিয়েছে।"

"তুমি কষ্ট পাওনি ?"

"আমার কি কষ্ট পাওয়া উচিৎ ?"

"তুমি এরকম আচরণ করছ কেন আমার সঙ্গে ?" বলেই শিলা কাঁদতে লাগল।

"তোমার কান্নাকেও আমি আর বিশ্বাস করিনা।"

"তুমি এটি বলতে পারলে মাহী!"

"কিছু ছলনা করলাম না কি ?"

এবার চোখ মুছে ফেললো শিলা। মনে হচ্ছে একটু শক্ত হল।

"হয়ত তোমাকে আর বিশ্বাস করাতে পারবনা আমি যে, আমার করার কিছুই ছিলনা। মানুষ কতটা অসহায় হতে পারে তা সেদিন নিজেকে দেখেছি। আমাকে তিন ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। বাবা পিস্তল হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিলেন। বিয়েতে রাজী না হলে মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করবেন। মা কাঁদছিলেন চিৎকার করে। ছোট ভাই বার বার আঙ্গুল উঁচিয়ে বলছিল "তোর জন্য আজ আমাদের পরিবার ধ্বংস হতে যাচ্ছে; তুই মানুষ না ?" এ অবস্থায় আমি রাজী না হয়ে কী করতে পারতাম ? একটা উপায় ছিল, আত্মহত্যা করা। কিন্তু এই কঠিন সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারিনি– যদি এটিই আমার অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী।"

"তুমি বিয়ে করেছ তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমার প্রশ্ন একটাই– তুমি সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে একটিবার জানালেনা কেন ? আমাদের পাঁচ বাছরের প্রেমকে তুমি মেরে ফেললে ঐ তিন ঘন্টার মধ্যে ! তোমার সঙ্গে চলেছি পাঁচ বছর, তোমাকে বিশ্বাস করেছি এতটা সময় অথচ একটিবারও বুঝতে পারিনি এর ফলাফল বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়! আজ আমার ভাবতে অবাক লাগে আমি মানুষ না অন্য কিছু!"

শিলা আবারও কাঁদতে লাগলো। কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। নিজেকে কিছুটা সামলিয়ে নিল শিলা।

"আমি জানি, এ প্রশ্ন তুমি আমাকে করবে। এর উত্তর দেয়ার জন্যই আমি বারবার তোমাকে কল করেছি, কিন্তু তুমি একটিবারও রিসিভ করনি। মাহী তোমাকে বিশ্বাস করেত অনুরোধ করব না, তবুও আমার সত্য কথাটি বলে যাই। সে সময় তোমাকে কথাটি জানাতে গেলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না। তোমাকে জানালে তুমি কোন উল্টোপাল্টা কিছুই করতে না, সেই ছেলে তুমি নও, বরং আমাকে রাজী হতেই বলতে, এ বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আমি সব গুলিয়ে ফেলতাম, তোমার কথা আমার কানে ঢুকা মাত্রই আমি সব কিছু ভুলে যেতাম, তুমি আমাকে ফেরালেও আমি ফিরতে পারতাম না। বিশ্বাস কর, তোমার কাথার মাঝে কী একটা মোহ ছিল, কী একটা যাদু ছিল যে, আমি শোনামাত্রই পাগল হয়ে যেতাম।"

"আমি বিশ্বাস করিনা। সব মিথ্যা। তুমি কখনো আমাকে ভালবাসনি, শুধু অভিনয় করেছ।"

"আমার ভালবাসা যে নির্মম সত্য তার রায় তুমিই দিয়েছ কতবার ! আজ যদি তুমি মনে কর ভুল বিচার করেছ, সর্ববিচারকতো একজন আছেন, তিনিতো কখনো ভুল করবেননা। তোমার মনে পড়ে, মাহী ?– ভার্সিটিতে তুমি রাজনীতি করতে। এক রাতে তোমার হলে খুব হট্টগোল মারামারি হয়। তুমিও সেখানে জড়িত ছিলে। পরদিন সকালে আমি হলে গেলাম। সময়টা মনে আছে, সকাল আটটা। তুমি হলের সামনের চত্বরে আমগাছের নিচে একটি বেঞ্চে বসা। সঙ্গে তোমার কয়েকজন বন্ধু ছিল। আমাকে দেখেই তুমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলে, "এত সকালে এসেছ কেন ?" তোমার উত্তেজনাকে পাত্তা না দিয়ে তোমার উপর আমার অধিকারের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ঠোঁটভরা হাসি নিয়ে বললাম, 'আমার ইচ্ছা!' তুমি এক সেকেন্ড দেরী না করে আমর গালে চড় বসিয়ে দিলে আর বললে, 'চলে যাও এখান থেকে ?' আমার চোখে-মুখে যত বিস্ময় আর লজ্জা জন্ম নিয়েছিল তার চেয়ে অধিকগুণে বিস্মিত ও লজ্জিত হয়েছিল তোমার বন্ধুরা। আমি আর কোন শব্দ উচ্চারণ না করে চলে আসলাম। কান্নার প্রচণ্ড ভীড় ছিল চোখে, কিন্তু তোমার সামনে গড়িয়ে পড়তে দিইনি। পরদিন ক্যাম্পাসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তোমাকে পেলাম ডাকসু ক্যাফেতে। একটা খালি টেবিলের একটা চেয়ারে বসে একাএকা সিগারেট টানছিলে। তোমাকে দেখেই আমি হেসে ফেললাম। কাছে গিয়ে তোমার হাতে হাত রাখলাম। বললাম, 'মাহী আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা কর। আমি হলের রাতের ঘটনাটি জানতামনা এবং তুমি সকালে যে কিছুটা অনিরাপদ ছিলে তাও জানতে বা বুঝতে পারিনি। গতরাতে রফিক ভাই ফোনে সব জানিয়েছে আমাকে। আমাকে ক্ষমা কর তুমি।' তুমি কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে ছিলে। একটা লজ্জাবোধ কাজ করছিল তোমার মাঝে। আমি তোমার চুলগুলো ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, 'এই হারামী! কথা বলবিনা ?' তুমি হেসে উঠলে। তখন আমি যে কতটা সুখী হয়েছিলাম তার হিসেব বিধাতা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব ছিলনা। তোমাকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি কিন্তু আজ করছি– তোমার হলের পরিস্থিতি খারাপ, এই ছোট্ট একটি কথা আমাকে থাপ্পড় মারার আগে বলনি কেন ? অথবা, আর একটি ছোট্ট কথা– 'তুমি এখন যাও'– এটিও তো বলতে পারতে ? এরপরও যদি বলো, আমার ভালবাসা মিথ্যা, তাহলে বলবো, সৃষ্টিকর্তা আমার মাঝে প্রেম-ভালবাসা কিছুই দেননি।

এরই মাঝে সিগারেট ধরিয়েছে মাহী।

অতীতের কথা আর নাইবা বললাম। বর্তমানটা এবার শোন। বিয়ের বয়স হল দুই বছর। এই দুই বছরে এক মুহূর্তের জন্যও আপন করে নিতে পারিনি স্বামীকে। বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তার প্রতি এক বিন্দু প্রেমও জন্ম নেয়নি আমার মনে। এর পুরোভাগ দখল করে আছ তুমি। স্বামীর প্রতি একটা স্ত্রীর যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে তার কিছুটা পালন করার চেষ্টা করি। সে খুব ভাল মানুষ। আমার কর্তব্য পালনের ব্যাপারে সে মোটেও সিরিয়াস নয়। স্বামী সেবার বিষয়টিকেও পাত্তা দেয়না বললেই চলে। তার শুধু চাই প্রেম। একেবারে চরম প্রেম! ক্ষিপ্র! কিন্তু তা তো দিতে পারিনা। এইতো মাসখানেক আগে সে একবার আমার মুখোমুখি হয়েছিল। কী বললো জান ? আমার মনের মধ্যে একরূপ আর বাইরে না-কি আর একটি; আমি না-কি তার সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছি। মাহী আমি বিশ্বাস করি, এভাবে চলতে চলতে একদিন এ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। সংসার আর টিকবেনা। কিন্তু আমি সংসার চাই। আমাকে আস্তে আস্তে ফিরতেই হবে– স্বামীকে ভালবেসে নাহোক অন্তত তার চাওয়া পাওয়াগুলোকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভালবেসে। সে কারণেই আজ তোমার কাছে আসা। বুঝতেই পারছ কত ভয়ঙ্কর এ যাত্রা! বাবা-মা স্বামী সবাইকে মিথ্যে বলেছি, বলেছি চন্দনার এক বান্ধবীর বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছি, শুধু একদিনের জন্য– তার মানে কালই ফিরতে হবে আমাকে। মাহী একমাত্র তুমিই পার আমাকে বাঁচাতে। তুমি আমার সঙ্গে কথা বললে আমার সব মোটামুটি ঠিকঠাক থাকবে; আর সপ্তাহে না পার পনের দিনে না পার অন্তত মাসে একবার তুমি আমার সঙ্গে দেখা করলে আমার আর কোন সমস্যাই থাকবেনা। কথা প্রতিদিন সম্ভব না হলে অন্তত পনের দিনে একবার বলো। এভাবে চললে আস্তে আস্তে আমি ঠিক হয়ে যাব– এছাড়া কিছুতেই আমার পক্ষে স্বামীর ঘরে মন বসানো সম্ভব নয়। মাহী আমার এ প্রার্থনাটুকু তুমি রাখবে না ?"

একক্ষণে সিগারেট টানা শেষ হয়েছে মাহীর। খুব মনোযোগের সাথে শব্দগুলো গলাধঃকরণ করেছে সে। চোখে চোখ রেখে নয়, মাথা নিচু করে। সে চোখের নিমেষেই শিলার দুই উরুর উপর দুই হাতে ভর দিয়ে মুখটা শিলার দিকে তুলে ধরে বললো, "তাহলে আমাকে আদর করতে হবে।"

শিলা হেসে ফেললো। মাহীর চুলে আঙুল বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, "এই, কিসের আদর!"

"সব! যত আদর আছে !"

"শয়তানি হচ্ছে, না !"

"না ? আমি সিরিয়াস!"

"এরকম করতে হয়না মানিক। উঠে বসো। আমার ব্যাপারে কথা বলো।"

"হ্যাঁ, সব করবো। তুমি যা যা বলেছ সব করবো, কিন্তু আমার চাই আদর।"

"ছেলেমানুষী করোনাতো ? উঠো।" হাসিমাখা ঠোঁটে বলল শিলা।

"না, আমি ছেলেমানুষী বা ফান করছি না ? আমি সিরিয়াসলি বলছি।"

"তুমি কী বলছো বুঝতে পারছো ?" শিলা তার মাথায় ধাক্কা দিয়ে আবারও বলে, "কী! মাথায় কী হয়েছে ?"

এবার মাহী আর স্থির থাকতে পারল না। একটানে শিলাকে মেঝেতে নামিয়ে আনলো। এখানেও ক্ষান্ত হল না, টেনে নিল বুকের মাঝে।

এতক্ষণে শিলা তার সিরিয়াসনেস সম্পর্কে সিরিয়াস হল। সে জোর করে বেরিয়ে আসতে চাইলো না। সে ভাবছে, জোরাজুরি করলে ফল উল্টো হতে পারে, বরং তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরাতে হবে, যেমনটি করেছে সে প্রেমময় দিনগুলিতে।

"মাহী ছাড় এবার। আমি অন্যের স্ত্রী, এটা খেয়াল আছে তোমার ?"

"না ? আজ আমি ফিরবনা ? খেয়াল থাকলেও খেয়াল করব না ?"

"তোমার প্রতি আমার এতদিনের বিশ্বাসকে এভাবে মেরে ফেলবে ?"

"আমার বিশ্বাসকে তুমি যে খুন করেছ ? খুনের বদলে খুন !"

"আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেঈমানী করবে ?"

"আমার ঈমান নষ্ট করেছ তুমি– এখন আমি বেঈমান ছাড়া আর কী!"

শিলা ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চোখে-মুখে ঘৃণামিশ্রিত রাগের ছোঁয়া।

"ছিঃ মাহী! ছিঃ ! তোমার এই রূপ! এই তোমার প্রেম!" মাহীও উঠে পড়লো। শিলার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

"আমার প্রেমে কোন বিশ্বাসঘাতকতা নাই। আজও আমার সমস্ত প্রেম তোমার জন্য– কিন্তু প্রেমের শেষপ্রান্ত হল দেহ,

আমি দেহ চাই; আমার প্রেমকে আমি এভাবে কষ্ট পেতে দিবনা ? আমি চাই এর পূর্ণতা।"

শিলা বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে আছে মাহীর দিকে। চোখে জমেছে বিন্দু বিন্দু জলকনা। ওদিকে মাহীর চোখ যেন মরুভূমি! মরুভূমিতে সূর্যের প্রখর তাপে বালি পুড়ে যে লালবর্ণ ধারণ করে তার চোখের ভেতরের রূপটা ঠিক সেই রকম।

শিলা আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ধাপ ফেললো। মাহী ধরে ফেললো হাত। শিলা ঘুরে তাকালো।

"শিলা, আজ কোন পরাজয় মানব না আমি------- Never ?"

মাহী বন্ধ করলো দরজা। শিলা সঙ্গে সঙ্গে মাহীর দু'পা জড়িয়ে ধরলো। কাঁদতে লাগলো।

"মাহী, আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসি, তোমার প্রতি আমার দুর্বলতায় এক আনাও কমতি নাই– তুমি জোর করে কিছু করতে চাইলে আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত ফেরাতে পারব না; দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও ! আমার দুর্বলতার সুযোগ তুমি নিওনা!"

বাতাস বইছে। একটু জোরেসোরে। মাঠের পানিতে ঢেউ উঠেছে। নতুন পানি। নতুন যৌবন। তাই বোধ হয় একটু উচ্ছলতা বেশী। ঢেউ এসে বাড়ি খাচ্ছে সড়কের বাতায়। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-উচ্চতায় ছোট-খাট সড়ক। মাহীর ঘরের পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে গ্রামের বুক চিরে বাইরের পানে। গ্রামীণ সড়ক। ছোট-খাট গাছ-পালা দুই ধারে। পাখিরা রাতে আশ্রয় নেয় এই গাছগুলোতে। নাম না জানা অনেক পাখি। তাদের কোন বাসা নাই। শুধু রাতের আশ্রয়ে এরা আসে এখানে। জোছনা একটু হেলে পড়েছে। আলোও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে। দূরের গাছগুলো আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে। গোটা গ্রাম নিস্তব্ধ। শুধু এই পাখিগুলো সময়ে অসময়ে কিচিরমিচির করে উঠছে। যেন মাহী আর শিলাকে নিয়ে তারা আলাপ করছে।

মাহী উঠে দাঁড়ালো। সিগারেট ধরালো। ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়ালো। শিলা বাধা দিল। টান দিয়ে কাছে বসালো।

"কোথায় যাচ্ছ ? কিছুতো আর বাকী নাই ! মন নিয়েছ, দেহও নিলে– এবার কি পালাতে চাচ্ছ ? ভয় হচ্ছে ? লজ্জা পাচ্ছ ? না-কি বিবেক জেগে উঠেছে ?"

মাহী কোন উত্তর দিলনা। বসে আপনমনে সিগারেট টানছে। শিলার চোখে আর কোন অশ্রু নাই। নাই সেখানে রাগের চিহ্নমাত্র।

"মাহী, এ মুহূর্ত থেকে আমি স্বাধীন। আমার আর কোন পিছুটান রইলো না– আমার নাই প্রেম, নাই মাহী। তোমার প্রেম হল পূর্ণ, আর আমারটা হল নিঃস্ব।" কথা শেষ করেই শিলা চলে গেল শোবার ঘরে।

৩

সকাল দশটা। ঝকমকে সকাল। বর্ষাকাল হলেও আজ আকাশে মেঘের আনাগোনা নাই। মাহী, শিলা, চন্দনা আর লতা এসে দাঁড়িয়েছে বড় সড়কের মোড়ে। অপেক্ষা। গাড়ীর জন্য।

গাড়ি এসে থামলো। শ্যালো ইঞ্জিন চালিত গাড়ী। এ গাড়ীতে করেই শিলাদের যেতে হবে বাসষ্ট্যান্ডে, কয়েক মাইল দূরে। গাড়ীটি ফাঁকা বললেই চলে। একটিমাত্র মহিলা যাত্রী বসে আছে। চন্দনা আর লতা মাহীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে বসলো। শিলা মাহীর দিকে না তাকিয়ে, কিছু না বলে অগ্রসর হল গাড়ীর দিকে। গাড়ীতে উঠার মুহূর্তে সে থামলো। কী যেন ভাবছে। শিলার যেকোন শব্দের অধীর প্রতীক্ষায় মাহী চেয়ে আছে তার দিকে। শিলা উঠে গাড়ীতে বসলো। শিলাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। লতা আর চন্দনা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছে। শিলাকে তারা দেখেও না দেখার ভান করছে। ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল। শিলার চোখের কোণ বেয়ে এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মনে হয় অপ্রতিরোধ্য। মাহী এক ধ্যানে, এক মনে তাকিয়ে আছে শিলার দিকে– তার চোখ আর চোখ নাই, যেন বর্ষার নতুন পানিতে ভরে উঠা ঐ মাঠ।

লগেন

১

অতি মাত্রায় ব্যস্ততা লগেনের। সারাদিন ব্যস্ততা। শুধু ছুটাছুটি। এ ব্যস্ততার একটাই লক্ষ্য– টাকা সংগ্রহ। কোন ধার-দেনা নয়, নিজস্ব সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে। সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি সে বিক্রি করবে। এ পর্যন্ত অর্ধেকের বেশী হয়ে গেছে অন্যের। এখন রয়ে গেছে বাড়ী, অবশিষ্ট বিঘা সাতেক জমি, কিছু গাছপালা আর বাড়ীর কিছু দামী আসবাবপত্র। বিক্রিত সম্পত্তির এখনো প্রায় অর্ধেক টাকা ক্রেতাদের হাতেই রয়ে গেছে। প্রথম দিকে চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তার সারা অস্তিত্ব জুড়ে দুশ্চিন্তা। এ দুশ্চিন্তা ক্রমশ সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে অসীমের দিকে। যদি ক্রেতারা আর বাকি টাকা না দেয়, যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি সুদামে বিক্রি না হয়, আবার হলেও সে যদি পুরো টাকা না পায়– এ সকল দুশ্চিন্তা। গায়ের রং কালো হলেও তার উপর একটা তেলতেলে অবস্থা সর্বদায় বিদ্যমান থাকে বলে লগেনের কালো রং তার কাছে অনেকটা সোনার মতই দামী। শরীরের গঠনও নাদুস-নুদুস। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকায় মনের স্বচ্ছলতাও বর্ষাকালের নদীর তরঙ্গের মতই সবসময় ঢেউ খেলে যায়– শুধু সুখ আর সুখ। সুখাদ্য গ্রহণে কোন কার্পণ্য নাই তার। সবকিছু মিলিয়ে জীবন-যাপনে এক ধরনের তৃপ্তি তাকে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু বৃদ্ধিরত দুশ্চিন্তার ক্রমশ কশাঘাতে নির্মমভাবে আহত হওয়ায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তেলুক চামড়া যে কিছুটা খসখসে হয়ে উঠেছে তা তার আত্মার আত্মীয় না হোক কাছের কেউ না হোক দূরের কেউও আন্তরিকতার সাথে লক্ষ্য করলে এ অবস্থা উপলব্ধি করতে তাকে সময়ক্ষেপণ করতে হবেনা।

আজ থেকে মোটামুটি মাস দু'য়েক আগে লগেনের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল তার দেশ ত্যাগের কথা। সেটি মুখ ফসকেই হোক আর ইচ্ছে করেই হোক সেই কথাই যে আজ তাকে কাঁদাবে তা সে সমস্যায় পড়ার আগে কখনও কল্পনা পর্যন্ত করেনি। পরভূমি আর অন্য কোন দেশ নয়, প্রতিবেশী দেশ ভারত। বাংলাদেশের যে

জায়গাটিতে তার নিবাস সেখান থেকে কিছু দূরের পথ অতিক্রম করলেই পেয়ে যাবে তার ঠিকানা।

২

লগেনের দেশ ত্যাগ নিয়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। কেন সে দেশ ছাড়ছে ? কী সমস্যা ? সে কি এখানে অনিরাপদ বোধ করছে ?– এ ধরনের নানান প্রশ্ন। অবশ্য এখনো পর্যন্ত এদেশে লগেনকে তার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হয়নি। এ দেশে জন্মের পর থেকে এখনো পর্যন্ত তার নিরাপত্তার রাজ্যে কোন শত্রুর আবির্ভাব হয়নি, শুধু একবার এক বিশ্বাসঘাতকতার পদতলে নিজের বিশ্বাস আর সততা বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাকে। ঘটনাটি ঘটেছিল নিজ গ্রামেই। ব্যবসার সম্পর্কের উপর ভর করে এক মুসলমান ছেলেকে একবার দশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। সে কোন স্বাক্ষর বা সাক্ষীর প্রয়োজন মনে করেনি। এ জায়গা দখল করেছিল তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসই একদিন বেঈমান হয়ে ধরা দিয়েছিল তার সামনে। সেই ছেলেটি বলেছিল, টাকা তাকে ফেরৎ দিয়েছে, তার মনে নাই, এবং এক পর্যায়ে তাকেই বিশ্বাসঘাতকরূপে সমাজের দশজনের কাছে পরিচিত করে তুলেছিল। কোন প্রমাণ না থাকায় বিচারের দায়-দায়িত্ব কেউই নেয়নি। সমাজের দু-একজন লোক ছেলেটির পক্ষ নিয়েছিল। পরে এরকম শোনা গিয়েছিল, তারা ছেলেটির কাছ থেকে এর বিনিময়স্বরূপ কিছু টাকা পেয়েছিল। এখন কারো কারো ধারনা যে, ঐ ঘটনাই লগেনকে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। যা হোক, লগেন এখনো পর্যন্ত মুখ খুলেনি তার দেশ ত্যাগের কারণ সম্পর্কে।

লগেনের গ্রামে মুসলমান ও হিন্দুদের পাশাপাশি বাস হলেও তার দেশ ত্যাগের বিষয় নিয়ে মুসলমান পাড়াতে আলাপ আলোচনা চললেও হাতে গুনা দু-একজন ছাড়া কেউই অন্য কোন ভূমিকা থেকে বিরত থাকছে। তাবে হিন্দুপাড়ায় বেশ জমে উঠেছে খেলা। হিন্দুপাড়ার বেশীর ভাগ মানুষ তার এ বিদায়কে স্বাগত জানাতে না পারলেও কিছু মানুষ এতে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। স্বার্থের ক্রমাগত আঘাতে এসেছে এ জোয়ার। এদের মধ্যে কেউ চায় বাড়ী, কেউ চায় পুকুর, কেউ চায় জমি। এ পুকুরের ওপর জিভ থেকে লালা ঝরছে একজন মুসলমানেরও। এদের মধ্যে আবার একে অপরের সাথে লিপ্ত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কিন্তু এ সম্পত্তি সমূহের যে মালিক তার

ভাষ্য এরকম– প্রয়োজনে বিনা পয়সায় অন্য কাকো দিয়া যামু, তাও এই চিটার বাটপারেরা কিছু পাবেনা।

৩

রাত ততটা ভারী হয়নি। দশটার কাঁটা পার হয়েছে মাত্র। লগেনের পরিশ্রমী শরীর কখনই এ সময় পর্যন্ত সতেজ থাকেনা, নেতিয়ে পড়ে বিছানায় দুনিয়ার সবকিছু ভুলে। কিন্তু দেশ ত্যাগের পূর্বের এ রাতগুলোতে সে কিছুতেই ঠিকমত ঘুমাতে পারছে না। যেন এখন প্রতিটি রাত তার জন্য অভিশাপ। সে পরপর দুটো বালিশ মাথার নিচে রেখে একের পর এক বিড়ি টেনে চলেছে। স্ত্রীর চোখেও নাই ঘুম। একবার চোখ বুজে আর একবার চোখ খুলে এপাশ-ওপাশ ফিরছে। এমন সময় মাথার পেছনে বন্ধ জানালায় বেজে উঠলো ঠকঠক শব্দ। দ্বিতীয়বার শোনার পর লগেন বলে উঠে, "কে ?"

আবারও শব্দ। কোন কথা নাই।

"কেরে ?" একটু জোরেসোরে বলল সে।

"হ্যামি দিদার। কপাট খুল ?" কণ্ঠধ্বনি উচুতেও নয়, আবার নিচুতেও নয়, মাঝামাঝি পর্যায়ে।

"কুন দিদার ?"

"ডাকাতপুরের।"

দিদার নামটি শুনেই লগেনের মনে একটা ছোট-খাট আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, ডাকাতপুর শব্দটি শোনার পর সেই আতঙ্ক পূর্ণতা পেল। হৃদয়ের ধিকধিক শব্দও চলা শুরু করেছে পূর্ণবেগে। স্ত্রী উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। চোখে তার অশ্রুর কোলাহল। কবুতরের বাচ্চা ভয় পেলে খোপের এক কোণে যেভাবে চুপটি মেরে বসে থাকে সেভাবেই বসে আছে দু'জন।

"কিরে খুলবুনা ? কী হল ?" এবার দিদার ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলল।

"ভাই এ্যাত রাতে কী দরকার। আমি অসুস্থ। ক্যালকা কতা বুলমুনি।" লগেন অতি নরম সুরে বলল।

"ঐ মালুর বাচ্চা! হ্যামি কি তুর বাড়ীত ডাকাতি দিবার আলছি ? ডাকাতি দিলেতো কপাট ভ্যাঙ্গাই ঢুকপ্যার পারি, কুন শোরের বাচ্চা এটি ঠ্যাকাবে ? কতা আছে, তাড়াতাড়ি কপাট খুল ?"

লগেন আর কোন শব্দ উচ্চারণ না করে দরজা খুললো। তার বাহু ধরে পাশাপাশি অবস্থান নিয়েছে স্ত্রী।

দিদারসহ ঢুকলো আরো চার পাঁচজন। লগেন কোন ভাল মানুষ না দেখে মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়লো। এতগুলো ডাকাত একসাথে বাড়ীতে প্রবেশ করলে কোন গৃহকর্তারই পক্ষে বোধহয় স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়, তবুও যে লগেন দাঁড়িয়ে আছে– এ কম বীরত্বের নয়। এরা দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি করে বেড়ায়– এদের লগেন কেন গোটা ইউনিয়নের যে কেউই চেনে। লগেন আর তার স্ত্রী এখন যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে, এরা দু'জনে অতীব প্রয়োজনের তাগিদে নিরূপায় হয়ে কিছু চাইতে এসেছে দিদারের বাড়ীতে।

"লগেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুন– ক্যাল দিন পরে সন্দ্যার মদ্যেই এক লাখ টাকা দিবু।" দিদার বলল।

লগেন আর তার স্ত্রী বোবার মত চেয়ে আছে ওদের দিকে। যেন এইমাত্র বিধাতা ওদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছেন।

"কিরে কতা কোসনা ক্যা ?" দিদারের এক সহযোগি ধমকের সুরে বলল।

"কী জন্যে ভাই।" লগেন কাতর কণ্ঠে জানতে চাইলো। স্ত্রীর চোখ বেয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

"আরে চাঁদা--------! চাঁদা----------! ইন্ডিয়াত চ্যলা যাত্তু, কিছু দিয়া যাবুনা!" দিদার বলল।

"এডা ক্যামুন কতা ভাই ?" স্ত্রী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল।

"এ্যামুনই কতা। আর কুনো কতা লয়, যা বুলিছি তাই করবু ?" কথা শেষ করেই দিদার তার দল-বল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্বামী-স্ত্রী বসে পড়লো খোলা দরজার কাছেই। স্ত্রীর কান্নার শব্দ বাড়ীর সীমারেখা পার হয়ে যাচ্ছে সন্দেহে লাগেন তার মুখ চেপে ধরে বলল, "থামো ? কান্নাকাটি করা যাবেনা। এ্যাকুন শত্রুর অভাব নাই, তারা এ্যাকুনো জ্যাগা আছে।" কথা শেষ করে সেও চোখ মুছলো।

"এ্যাকুন কী হবে ? কী করমু ? ভগবান তুমি এডা সহ্য করোনা।" বলতে বলতে স্ত্রী আবারও কাঁদতে লাগলো।

লগেন দরজায় মাথা ঠেস দিয়ে ভাবছে, "দিদার জানল কী করে ?" স্ত্রী কাছে এসে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'দরজা বন্দ ক্যরা ঘরোত চলো।'

লগেন কিছুটা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'না ?' স্ত্রী আর কিছুই বলল না। আঁচল মুখে চেপে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো।

লগেনের বুঝতে এখন আর এতটুকু বাকি নাই যে, কাদের চক্রান্তে দিদাররা এসেছে চাঁদা চাইতে। সে এখন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মনের দিক দিয়ে অন্তত তার বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে। চোখের জল ভাল করে মুছে সে মনে মনে বলে উঠে, 'কুত্তার বাচ্চারা! আমি ম্যরা গেলেও তুরকেরে কাছে কিছু বিক্রি করমুনা!' আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সিদ্ধান্ত নিল, কালকের মধ্যেই বাকী সম্পত্তি বিক্রির ব্যবস্থা করবে। আরো একটা সিদ্ধান্ত নিল, কালকের পরদিনই সে ত্যাগ করবে এ দেশ।

সকাল হতে না হতেই লগেন ছুটলো তাদের বাড়ী যাদের সঙ্গে সে আলাপ করে রেখেছিল সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে।

শেষমেশ এ কথা পাকা হল যে, আগামীকাল সবকিছু রেজিষ্ট্রি হবে। লগেন কাল নিবে অর্ধেক টাকা আর বাকি অর্ধেক টাকা নিবে পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে। ওদিকে পূর্বে বিক্রি করা সম্পত্তির বাকি পাওনা টাকার মোটামুটি একটা অংশ সে আজ নিয়ে নিল। টাকা দেয়ার তারিখ আগামীকাল হলেও ক্রেতারা আজ দিতে কোন আপত্তি করেনি। এখানেও কথা হল, অবশিষ্ট টাকা সে আগামী পনের দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে।

৪

আযানেরও আগে লগেন ও তার স্ত্রী উঠে পড়েছে। এতক্ষণ এক সেকেন্ডের জন্যও চোখের দু'পাতা এক হয়নি লগেনের। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে ঢুকানোই ছিল। বাড়ীর সব দরজায় তালা মেরে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে স্ত্রী আর দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো লগেন।

সীমান্তের কাছাকাছি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বউ ছেলে-মেয়েদের রেখে লগেন যথাসময়ে উপস্থিত হল উপজেলা রেজিষ্ট্রি অফিসে। কাজ শেষ হওয়ার পর টাকা বুঝে নিল লগেন। বাড়ীর চাবি ক্রেতার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে সে ফিরে এল আত্মীয়ের বাড়ীতে।

৫

গোধূলী লগ্ন। দু'দেশের মাঝে সীমানা চিহ্নিত মাঝারী আকারের একটা পিলারের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লগেন, তার স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে আর তাদেরকে এগিয়ে দিতে আসা লগেনের আত্মীয় নিপেন।

নিপেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধাপ তুলতেই থেমে যায় লগেন। ফিরে তাকায় জন্মভূমির পানে। নিমেষেই দু'চোখ ভরে উঠেছে জলে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে বলে, "নিপেন, আগেতো ককুনো বুজিনি এই দেশোক এত ভালবাসি!"

"দাদা, এই দে কে তুমি ককুনোই ভালবাসনি, এই দেশই তুমাক ভালবাসিছে– এডা তুমার জল লয়, এডা দেশের জল।"

আর কিছু বলেনা লগেন। নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিপেনের দিকে। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ভূমিতে। লগেনের স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে টেনে নিল সীমান্তের ওপারে।

সালিশ

১

হাট থেকে ফিরছে গয়ের আলী। উৎফুল্ল সে। আগামীকাল ঈদ। ঈদের টাটকা আমেজে সে উল্লসিত। মোটামুটি বাজার করেছে সে ঈদ উপলক্ষ্যে। খাবারের বাজারের সাথে কাপড়ও কিনেছে। বউয়ের জন্য কিনেছে একটা শাড়ী। এজন্য আনন্দটা একটু বেশীই। গত দুই বছরে একটা শাড়ীও সে বউকে কিনে দিতে পারেনি। অবশ্য এটা নিয়ে বউয়ের মাঝে মধ্যে অভিমান হলেও তা ঝগড়া পর্যন্ত গড়ায়নি। তিন ছেলে-মেয়ে তার। দুই মেয়ে আর এক ছেলে। ছোট ছোট। ছেলে বড়। বয়স হবে দশ বছরের মত। আর পরপর দুটি মেয়ে। মাত্র এক বছরের ব্যবধান। বয়স একটার সাত, আর একটার ছয়। তাদের জন্য জামা-কাপড় নিয়েছে। ছেলের জন্য একটা শার্ট আর মেয়েদের জন্য একটা করে ফ্রক।

প্রায় মাইল দুয়েকের পথ হেঁটে বাড়ী ফিরলো গয়ের আলী। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই মন খারাপ হয়ে গেল তার। হাসিভরা মুখ মুহূর্তের মধ্যে কালো হয়ে উঠলো। অন্যদিন সে বাইর থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বউ হাসিমুখে কাছে আসে। হাতে কিছু থাকলে তা নিজের হাতে নেয়, বসতে দেয়, পানি দেয়। আজও কাছে এসেছে, হাতের ব্যাগটিও নিয়েছে, কিন্তু মুখে নাই হাসিটুকু। বউকে সে খুব ভালবাসে। তাকে সে সবসময় হাসিখুশী দেখতে চায়। অভাবের ক্রমাগত আঘাতে সেই হাসি মাঝে মাঝে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাতে তার বউয়ের উপর রাগ হয়না। সে ঐ না হাসার কারণটা বুঝে। সে তার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যায় বউকে হাসিখুশী রাখতে। কিন্তু আজ সে না হাসার কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছেনা। আজ বউ প্রচণ্ড হাসি-খুশী থাকবে এটিই সে হাট থেকে ফিরছিল আর ভাবছিল। কিন্তু বউ-এর এ অবস্থায় সে অনেকটাই হতবাক। কোন কিছু না বলে সে টুলে বসলো। বউ এক গ্লাস পানি দিল। কিন্তু পানি খেতে ইচ্ছে করছেনা তার, যদিও তৃষ্ণা আছে। শুধুই ভাবছে, কী এমন হলো যে বউ অমন গোমড়া মুখ করে আছে। হাটে যাওয়ার আগেও সে এমন দেখে যায়নি। ওদিকে বউয়েরও

বুঝতে বাকি নাই যে স্বামী বেচারার ভাল মুখটি তার কারণেই কাল হয়েছে। সেও একটা টুল টেনে স্বামীর মুখোমুখি বসলো। স্বামীর মুখ দেখে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে সে। বউই কথা শুরু করলো।

"সরদার সালিশ ডাকিছে।" গয়ের আলী বউয়ের দিকে চেয়ে আছে। বউ আবারও বলে, "তুমাক লিয়া সালিশ।" গয়ের আলী বিস্মিত হলো। বুঝতে পারছে না, তাকে নিয়ে সালিশ কেন। কী করেছে সে, তাই ভাবছে।

"এ্যাকুনই যাও, সুময় হ্যয়া গেছে।" সে ভেবে পাচ্ছে না, কী তার অপরাধ।

"কারণডা কী, কছে ?"

"না।"

বউ খুবই চিন্তিত। সরদার মানুষ ভাল না, মানুষের বিপদ ডেকে আনাই তার কাজ– ভাবছে, না জানি আজ তার স্বামী কোন অপরাধে কোন বিপদে পড়বে।

২

সালিশ বসেছে। সমাজেরই সব মানুষজন। সরদার ছাড়া বিচারকের দায়িত্বে আছে আরো একজন। দুইজনই সমাজের মাতবর। সরদার বড় মাতবর, আর সঙ্গীজন ছোট মাতবর। অবশ্য রায় দেয়ার ভার সরদারের।

গয়ের আলী বসে মাথা নিচু করে তার অপরাধ খোঁজার চেষ্টা করছে।

"গয়ের আলী, তুর বিরুদ্দে একটা অভিযোগ আছে। খুব বড় অভিযোগ। হ্যামি ভ্যাববারই পারিত্তিনা তুই কী ভাবে এই কাম করলু!" গয়ের আলী অবাক হয়ে শুনছে ছোট মাতবরের কথা।

"তুই বুজবার পারুত্তু তুর অপরাদ কী ?" সরদারের প্রশ্ন। ওদিকে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে সরদার– "গয়ের আলী অ্যাজকা তুক প্যাছি! হামার মাতব্বরি ম্যানবার চ্যাসনা , এ্যাঁ ? হামাক ভণ্ড কোস , সুদখুর কোস– অ্যাজকা তুক দ্যাকামু মাতব্বরি কাক কয় !"

গয়ের আলীর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। সে শুধু ধীর কণ্ঠে বলল, "না চাচা।"

"হ্যাঁ, এডাই স্বাভাবিক ! অপরাধকারীরা লিজের অপরাধ সবমুসয় জ্যানাও না জানার ভান করবে।" আরেক বিচারক কিছুটা রহস্যময় চোখে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল।

"য্যাক, এত কতা না ব্যুলা সুজাসুজি কতা বুলাই ভাল। গয়ের আলী, কদ্দিন থ্যাকা নিশা করিস ?"

গয়ের আলী বুঝতে পারেনা। "কী বুলিত্তে সরদার ? নিশা! নিশা কদ্দিন করনু আবার ?" ভাবতে থাকে সে।

"কীরে কতা কোসনা ক্যা ?" ধমক দিয়ে বলল সরদার।

"নিশা হ্যামি করিনা।"জোরের সঙ্গে বলল গয়ের আলী।

"নিশা করিসনা, আঁ!" ভেংচি কেটে বলল সরদার। আবার শুরু করল, "নিশা যদি নাইই করিস তুই তালে তুর বাড়ীত ফেনসিডিলের বুতোল অ্যালো কুন্টে থ্যাকা ? মানুষ য্যায়া তুর বাড়ীত ফেলা দিছে কবার চাত্তু ? তুই ক্যালকা অ্যাত্রে খাছু, এডা এই গাঁয়ের একজন দেকিছে। কী, অ্যাত্রে শুতার সুময় বুতোলের মুক দিয়া কিছু খ্যাসনি তুই ?" গয়ের আলী এখনো বুঝে উঠতে পারেনা আসল ঘটনা কী। ফেনসিডিল শব্দটিও তার কাছে পরিচিত নয়।

"গয়ের আলী, হ্যামি কি মিছা কতা কনু ?" সরদার বলল।

"বুতোলের মুকোত ক্যরা ক্যালকা অ্যাত্রে হ্যামি সদ্দি-কাশের ওষুদ খ্যাছি, আর কিছু জানিনা।"

"গয়ের আলী, দ্যাকেকতো, এই বুতোলই সেই বুতোল কিনা ?" সরদারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট মাতবর গয়ের আলীর দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাতে লাগলো।

"হুঁ--- এই বুতোলই।" গয়ের আলী এক মুহূর্ত দেরী না করে খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল। গ্রামবাসির দিকে বোতলটি উচিয়ে সরদার বলল, "গামবাসী, এই বুতোল অর বাড়ীতে থ্যাকা আনা হছে, অর বউই ঘরোত থ্যাকা ব্যার ক্যরা দিছে। দরকার মনে করলে আপনারা অর বউয়ের কাছে য্যায়া প্রমাণ করবার পারেন। ফেনসিডিলের বুতোল এডা। ফেনসিডিল কী তা আপনারা জানেন। এডা নিশার বুতোল। এডা খ্যালে নিশা হয়। একটু শিক্ষিত গোছের কয়েকজন মাথা ঝুঁকিয়ে সরদারের কথায় সায় দিল। তালে এডা প্রমাণ হল জি, গয়ের আলী নিশা করে। এবার গয়ের আলীর দিকে চেয়ে –

"ছিঃ-----! ছিঃ-------! ছিঃ--------! কী নাফরমানি কাম! কী কুফুরী কাম! আল্লাহ্ কতখানি ব্যাজার হছে তুই জ্যানিস ? এই সমাজোত বাস ক্যরা তুই ক্যামুন ক্যরা এডা করবার সাহস পালু ? হামার মাতা কাম করিত্তেনা।"

"গয়ের আলী তুক শাস্তি দ্যাওয়া ফরজ, না দিলে হামাকেরে পাপ হবে।" ছোট মাতবর বলল।

"হামার কতা আছে।" গয়ের আলী কাতর হয়ে এটুকু বলতেই সরদার ধমক দিয়ে বলে উঠলো, "চুপ ? কুনো কতা নাই ? নেশাখুরের কুনো কতা থ্যাকপার পারেনা।"

"না ? হামার কতা আছে।" গয়ের আলীকে কিছুটা উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

"ঠিক আছে– ক ? কী তুর কতা ?" ছোট মাতবর বলল।

"এই বুতোল খ্যালে নিশা হয় কি-না জানিনা। একদিন সাঁজে ব্যালা শাহপাড়ার জাবেদ দিছে। হ্যামি কিছু কইনি অক। হামার সদ্দি-কাশ দেকা এই বুতোল দিয়া কলো, 'এ্যানা এ্যানা ক্যরা খ্যাস, সদ্দি-কাশ ভাল হ্যয়া যাবেনি।' তাই হ্যামি খ্যত্তি।"

গয়ের আলী আর কিছু বলবে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চেঁচিয়ে উঠলো সরদার– "চুপ কর ব্যাদপ ? আবার নাফরমানি কতা কোস ? কত পাপ আর লিবু ? এ্যাকুনো মিছা কতা কত্তু ?"

"হামার ভুল হ্যয়া গেছে, হ্যামি বুজব্যার পারিনি। হ্যামি ভুল ক্যরা খ্যাছি। হামাক মাপ ক্যরা দ্যান।"

এবার সংগী বিচারক বলল, "শুন গয়ের আলী, এডা পুরাপুরি আল্লাহ্‌র ব্যাপার, হামরা কিছু লয়– আল্লাহ্ এডা কিছুতেই ম্যানবেনা। তার কাছে কোন অজুহাত চলবেনা।" কথা শেষ করেই সে চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব এনে সাথে সাথে বলল, "আল্লাহ্ এরই মধ্যে হামরা ম্যালা উল্টা-পাল্টা কতা বুলা ফেলিছি– মাপ করো; হে রাহমানুর রাহীম, ব্যাবাকোক মাপ করো, আর তুমার পাপীষ্ট বান্দাদের জ্ঞান দান করো।"

গয়ের আলী আরও একবার অনুরোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ তার উপর অখুশী এটা জেনে আর মুখ খুলল না। হঠাৎ ঝড়ের মত একটা ভয় এসে চেপে বসলো তার মনে।

সরদার বললো, "শুন গয়ের আলী, আল্লাহ তুক ককুনই মাপ করবেনা। তারপরও হামরা দু'আ করি গাফুরুর রাহীম তুক মাপ ক্যরা দিক। কিন্তু এডা হ্যামি মাপ ক্যরা দিবার পারমুনা কারণ সমাজের মাতা হিসাবে বিচারের দিনে হামার একটা জবাবদিহিতার ব্যাপার আছে। তাই তুর এই অপরাদের জন্যে দুইশ' ট্যাকা জরিপনা

করা হলো। ক্যালকা ঈদের নামাজের আগেই এই ট্যাকা দিয়া দিবু, তাছারা তুক তিন মাস আটক দ্যাওয়া হবে। এই ট্যাকা ফকির মিসকিনোক দিয়া তুর জন্যে দু'আ করবার বুলা হবে।"

বিচারের রায় ঘোষণার পরপরই কাশী উঠলো গয়ের আলীর। কিছু সময় ধরেই সে কাশলো। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। গ্রামবাসির মাঝ থেকে দু-একজন বলতে চাইলো, এবারের মত গয়ের আলীকে ক্ষমা করে দেয়া হোক, সে ভুল করেও খেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলল না। মনের কথা মনেই থেকে গেল।

"কিরে শাস্তির কতা শুনা কাশ আরম্ভ হ্যয়া গেল নাকি ?" সরদারের চোখে-মুখে-ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। গয়ের আলী নিঃশব্দে নির্বিকার চোখ-জোড়া তুলে চাইলো একবার সরদারের দিকে।

৩

বিচার শেষ হল। গয়ের আলী ধীরপায়ে এসে দাঁড়ালো খালের পাড়ে। গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে খালটি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড় না হলেও সৌন্দর্য্যের বিচারে অনেক বড়। দু'পাড়িতে সারি করে দাঁড়ানো জানা অজানা অনেক গাছ, নীচে জমিনের উপর সবুজ বিছানা, দুটি গাছের মধ্যবর্তী একেকটি ফাঁক যেন একেকটি ছাদবিহীন ঘর, দু-এক জায়গায় পাড়ের কিনার ঘেঁষে নেমে গেছে বুনো ঝাড় যেখান থেকে দু-একটি লম্বা শাখা খালের প্রায় মাঝ পর্যন্ত পৌছেছে, মৌসুমকালে ফুলে-ফলে ভরে উঠে এই ঝাড়গুলো, সবসময়ই ছোট-ছোট নাম নাজানা পাখী এখান থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়, আবার কিছুক্ষণ পর আসে ফিরে আর তাদের সারাক্ষণ কিচির-মিচির শব্দে মুখরিত হয়ে থাকে চারপাশ, খালের স্বচ্ছ পানির হৃদয় চিরে দৃষ্টি যায় অনেক দূর, পানির তলায় সুবিস্তৃত বালির বিছানা। সারা বছরই পানি থাকে এখানে। কিছুদিন আগে শেষ হল বর্ষার তাণ্ডব– তাই খাল এখন পূর্ণ যৌবনোদীপ্ত। গয়ের আলীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এটি। প্রতি রাতে সে এখানে আসে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে সে কাটায় দীর্ঘক্ষণ– শান্ত কোমল হয় মন, তারপর ঘরে প্রত্যাবর্তন।

ঘাসের উপর শুয়ে বিড়ি ধরিয়েছে গয়ের আলী। ঘন ঘন টানছে। মাথা ঝিমঝিম করছে চিন্তার ভারে। হালকা ব্যাথাও শুরু হয়েছে। পকেটে আছে দেড়শ টাকা। ঈদের দিন ছেলে মেয়েদের বিশ টাকা করে দিবে ষাট টাকা, বউকে দিবে পঞ্চাশ টাকা আর

সে রাখবে চল্লিশ টাকা– হাট থেকে ফেরার পথে সে এমন পরিকল্পনা করে রেখেছে; বউ বাচ্চাদের ঈদের দিনে টাকা দিতে পারছে, আর দশজনের মত নিজের টাকা দিয়ে বউ-বাচ্চারা কিছু কিনতে পারবে এটা ভাবতেই তার বুক এই কিছুক্ষণ আগে উল্লাসে কেঁপে উঠছিল বারবার কিন্তু সরদারের দণ্ডভারে সেই উল্লাস এখন নিস্তব্ধ। ভাবছে, পঞ্চাশ টাকা কারো কাছ থেকে নিয়ে এই দেড়শ আর পঞ্চাশ মিলিয়ে দুশো টাকা কাল দিয়ে দিবে। পরক্ষণেই ভাবছে, 'সুদ ছাড়া ট্যাকা কে দিবে ? এমুনকি সরদারও দিবেনা। কিন্তুক না, সুদের উপুর ট্যাকা নিমুনা। জীবন গেলেও লয়! আর এই ট্যাকা দিয়া দিলে বউক– ব্যাটা-বিটিক কী দিমু ? অরা এতিমের মতন ম্যানষের ব্যাটাবিটির মুকের দিকে চ্যায়া থ্যাকপে ? না ? এডা হ্যামি সহ্য করবার পারমুনা।' শেষ বাক্যটির শেষ কালে চোখ থেকে অবলীলায় গড়িয়ে পড়লো দু'ফোটা জল। সে কী করবে, ভাবছে। আবার বিড়ি ধরালো। আরেকটা উপায় কিছুক্ষণ থেকে তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই তাতে মন সায় দিচ্ছে না– ঈদের দিনে খাওয়ার জন্য রাখা একমাত্র হাঁসটি বিক্রি করে টাকা যোগাড় করা। বড় হাঁস। দেড়শ টাকা হবে। কিন্তু সে ভাবছে, 'এই হাঁস বিক্রি করলে চ্যাংড়া-চেংড়িরা কী খাবে ? ঈদের দিনে কে ভাল খাবার চায়না ? এডা চরম অন্যায় হবে, ব্যাটা-বিটিরা খুব কষ্ট প্যাবে– না, এডা কুনোমতেই করা যাবেনা ?" এ উপায়ের কাছেও সে নতি স্বীকার করল না। এখন টাকা যোগাড়ের আরতো কোন উপায় সে দেখছে না, কিন্তু টাকা তাকে দিতেই হবে নইলে তিন মাসের জন্য এক-ঘরে হতে হবে।

আরো কিছুক্ষণ ভাবার পর সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে টাকা দিবে না, তিন মাস একঘরে হয়েই থাকবে তবুও সে আগামীকাল ছেলে-মেয়েদের হাসিভরা মুখ দেখতে চায়। এ সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের জোরও বেড়ে গেল। কেবলই তার মনে হচ্ছে, সে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। সে একদম ঠিক, সরদারই ভুল। গামছা কোমরে বেঁধে আর একটি বিড়ি ধরিয়ে পা বাড়ালো বাড়ীর দিকে। কিন্তু না– দু' চারধাপ দিতেই আড়ষ্ট হল পদযুগল, থমকে গেল মন; এক নিমেষেই ফ্যাকাশে হল মুখমন্ডল, রক্তের লাল আভা কোথায় যেন পালালো। সে ধপ করে বসে পড়লো।

ঈদের চাঁদ– সেই কখন ডুবে গেছে! একটুখানি দেখা দিয়েই নিয়েছে বিদায়। দিগন্তজোড়া এখন আঁধারের প্রভূত্ব। ঝিরঝিরে বাতাসে অনুভূত হচ্ছে এক ধরনের

শিরশিরে ছোঁয়া– না বোঝাটা অন্যায় যে, শীত আসছে। মাঠের ফসল দুলছে, গাছের পাতা নড়ছে, নড়ছে গয়ের আলীর পেছনের লম্বা চুল; খালের যৌবনে লেগেছে প্রেমের ছোঁয়া– পানি খাচ্ছে দুল; গগনে মেঘ জমেছে কিনা আঁধারের ভিড়ে তা বোঝা দুরুহ, শুধু তার গায়ে দৃশ্যত হচ্ছে মিটমিট করে জ্বলা দু'একটি তারা। গাঁয়ের জঙ্গলে বাঁশঝাড়ের উপর বসবাসরত সাদা বকের দল থেকে থেকে সজোরে ডেকে উঠছে একত্রে; দূর-দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে মাইকের শব্দ– রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ---------; আর কিছুক্ষণ পরপরই গর্জে উঠছে ঈদের পটকাগুলো।

গয়ের আলী উঠে দাঁড়ায়, আঙ্গুল তুলে উপরে– "আল্লাহ্, এই অ্যাত আর কুনোদিন পোয়াবে না, তুই যদি সকাল করিসই তালে হামার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়া সকাল করবু-হামার জীবনের দাম বেশী, না একটা ভুলের দাম বেশী ?"

ISBN : 984-70200-0060-0

9 847020 000600

PARER DAK
a collection of small story by Forrukh Ahmmed
Cover Design : Moshiur Rahman
Printed in Bangladesh